এইচ জি ওয়েলস-এর

ডক্টর মরোর দ্বীপ

রূপান্তর সায়েম সোলায়মান

অনুবাদ

ডক্টর মরোর দ্বীপ

মূল: এইচ.জি.ওয়েলস

অনুবাদ: সায়েম সোলায়মান

দ্বীপটা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সেখানে আছে
গোপন ও সুরক্ষিত এক গবেষণাগার।
প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানীর আবাস সেটা,
ভয়াবহ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে যিনি
বলতে গেলে বিতাড়িত হয়েছেন ইংল্যাণ্ড থেকে।
অদ্ভুত কিছু লোক ঘুরে বেড়ায় সে-দ্বীপে,
যারা আসলে মানুষ না কী বুঝিনি প্রথমে।
...যাচ্ছিলাম ক্যালাও, দুর্ঘটনায় ডুবল জাহাজ,
কোনোমতে গিয়ে উঠলাম ওই দ্বীপে।
যা দেখলাম, সেটা যেন ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টির
ক্ষুদ্র অথচ অদ্ভুত সাদৃশ্যযুক্ত এক সংস্করণ।
পার্থক্য একটাই—সৃষ্টির উপর স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ হারানোর
পরিণতিটাও দেখতে হলো আমাকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩,
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

The Island of Doctor Moreau
By: H. G. Wells
Trans. By: Sayem Solaiman

বিয়াল্লিশ টাকা

ভূমিকা

১৮৮৭ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি ১ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১০৭ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পরিত্যক্ত কোনো জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে "লেডি ভেইন" নামের জাহাজটা ডুবে যায়।

আমার চাচা এডওয়ার্ড প্রেনডিক ওই জাহাজে করে ক্যালাও যাচ্ছিলেন। জাহাজডুবির খবর পেয়ে আমরা ধরে-নিলাম তিনি মারা গেছেন। কিন্তু ১৮৮৮ সালের ৫ জানুয়ারি, মানে দুর্ঘটনাটার এগারো মাস চার দিন পর, ৫ ডিগ্রি ৩ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১০১ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁকে। অসহায়ের মতো একটা নৌকায় ভাসছিলেন তিনি। নৌকাটার নাম জানা যায়নি, তবে সেটা বোধহয় হারিয়ে যাওয়া স্কুনার "আইপেকাকুয়ানহা"-এর।

উদ্ধার পাওয়ার পর চাচা এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন যে, সবাই ভাবল তিনি পাগল। পরে চাচা নিজেও অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, "লেডি ভেইন দুর্ঘটনা"-এর পর উদ্ধার পাওয়ার আগ পর্যন্ত এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে, তিনি নিজেও তাল রাখতে পারেননি। আরও পরে তাঁর কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে আমি এমন কিছু লেখা খুঁজে পাই, যেগুলো ছাপানোর ব্যাপারে কখনও কিছু বলেননি তিনি; কিন্তু তাঁর ভাতিজা ও উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে আপনাদের না-বলেও পারছি না।

চাচাকে যে-জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়, তার কাছেপিঠে "নোবেল'স আইল্যান্ড" নামে একটামাত্র দ্বীপ ছিল। দ্বীপটা ছোট,

আগ্নেয়, জনবসতিহীন। ১৮৯১ সালে সেখানে যায় এইচ.এম.এস. স্করপিয়ন নামের একটা জাহাজ। এক দল নাবিক দ্বীপে নামে; কিন্তু কিছু সাদা মথ, শুয়োর, খরগোস আর অদ্ভুত একজাতের ইঁদুর ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী দেখতে পায়নি।

এখন ভেবে দেখুন–চাচা যে-জায়গা থেকে হারিয়ে গেলেন, এগারো মাস পর প্রায় একই জায়গায় পাওয়া গেল তাঁকে। এই সময়ে কোনো-না-কোনোভাবে বেঁচে থাকতে হয়েছে তাঁকে।

এবার অন্য একটা ঘটনা বলি। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে একটা পুমা এবং আরও কিছু জন্তু নিয়ে "আইপেকাকুয়ানহা" নামের একটা জাহাজ আফ্রিকা থেকে রওয়ানা হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন জন ডেভিস তখন ছিলেন মাতাল অবস্থায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু বন্দরে একনামে পরিচিত ছিল জাহাজটা। যা-হোক, ওই বছরের শেষদিকে সেটা বায়না পৌঁছে এবং ডিসেম্বরে সেখান থেকে আবার রওয়ানা হয়; কিন্তু শেষপর্যন্ত হারিয়ে যায় (তখন জাহাজে নারকেলের শুকনো শাঁস ছিল প্রচুর পরিমাণে)।

চাচাও হারিয়ে গেলেন, কয়েক মাস পর আইপেকাকুয়ানহাও উধাও হলো, তারপর শুরু হলো আশ্চর্য এই কাহিনির। বর্ণনাটা বরং চাচার মুখ থেকেই শোনা যাক।

চার্লস এডওয়ার্ড প্রেনডিক

এক

"লেডি ভেইন দুর্ঘটনার" ব্যাপারে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার, জাহাজটা ডুবে যাওয়ার আঠারো দিন পর সাতজন নাবিকসহ জাহাজের লংবোট উদ্ধার করে এইচ.এম. গানবোট মার্টল। আরেকটা ডিঙি নৌকায় চারজন লোক ছিল; ওদের সবাই মারা গেছে বলে মনে করে অনেকে, কিন্তু কথাটা আসলে ভুল। কারণ আমি সেই চারজনের একজন।

আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি—ডিঙিতে চারজন না, আসলে তিনজন ছিলাম আমরা। ডিঙিতে চড়ার জন্য জাহাজ থেকে লাফ দেয় কন্ট্যান্স, কিন্তু নৌকার কাছে পৌঁছাতে পারেনি বেচারা। বৌস্প্রিটের দড়িতে পা আটকে যায় ওর, মাথা নীচের দিকে দিয়ে এক মুহূর্ত ঝুলে থাকে সে, তারপর পানিতে পড়ে বাড়ি খায় বড় কোনো ভাসমান কাঠের টুকরার সঙ্গে। দাঁড় টেনে আমরা হাজির হই কন্ট্যান্স যে-জায়গায় ডুবেছিল সেখানে, কিন্তু আর দেখতে পাইনি ওকে।

একদিক দিয়ে সৌভাগ্যবানই বলতে হবে কন্ট্যান্সকে। কারণ আমাদের সঙ্গে ছিল অল্প কিছু বিস্কিট, তা-ও আবার ভেজা। আমরা ভাবলাম জাহাজে যারা আছে তাদের অবস্থা বোধহয় আমাদের চেয়ে ভালো, তাই চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম ওদেরকে, কিন্তু ওরা শুনতে পেল না। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল,

পরদিন দুপুরের দিকে থেমে গেল সেটা, তখন দেখি লেডি ভেইনের কোনো চিহ্নই নেই। নৌকা খুব বেশি দুলছিল বলে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে পারলাম না।

নৌকায় আমার সঙ্গে যে-দু'জন ছিল তাদের একজনের নাম হেলমার—আমারই মতো সাধারণ এক যাত্রী। আরেকজন নাম-না-জানা বেঁটে, বলিষ্ঠ আর তোতলা এক নাবিক।

ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় টানা আট দিন ভাসলাম আমরা। প্রথম দিনের পর কথা বলা কমিয়ে দিলাম, নৌকার মধ্যে যার যার জায়গায় শুয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম দিগন্তের দিকে। দ্বিতীয় দিন শেষে আস্তে আস্তে শান্ত আর ঝকঝকে হয়ে উঠল সমুদ্র, প্রচণ্ড বাড়ল রোদের তেজ। চতুর্থ দিনে পানি শেষ হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর সব চিন্তাভাবনা পেয়ে বসল আমাদের তখন, চোখের ভাষায় সেসব প্রকাশও করতে লাগলাম আমরা।

এ-ক'দিন আমরা যা ভাবছিলাম সেটাই বলে ফেলল হেলমার সম্ভবত ষষ্ঠ দিনে। লটারির কথা বলল সে। হিসাবটা সহজ—লটারি করা হবে, যার নাম উঠবে সে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়বে সমুদ্রে। তাহলে বাকি দু'জন আরও কিছুদিনের জন্য বেঁচে থাকতে পারবে হয়তো। কিন্তু অমানবিক এ-প্রস্তাবে রাজি না-হয়ে বললাম, 'তারচেয়ে ফুটো করে নৌকা ডুবিয়ে দিলেই তো ভালো হয়। যে-সব হাঙর আমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে সেগুলোর পেটে চলে যেতে পারবো তিনজনই।'

হেলমার বলল, 'আমার কথামতো কাজ করলে আর কিছু না-হোক অন্তত পানি তো খেতে পারবো?'

শুনে নাবিক লোকটা এগিয়ে গেল ওর দিকে। সারা রাত ধরে ফিসফিস করে হেলমারকে কী সব বলল সে। আমিও আমার ছুরিটা হাতে নিয়ে বসে থাকলাম নৌকার একপ্রান্তে, প্রয়োজনের

সময় লড়তে পারবো কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিল যদিও।

পরদিন সকালে হেলমারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। তিনজনের মধ্যে কে বাদ যাবে বের করার জন্য কাজে লাগালাম একটা আধুলি। লটারিতে নাম উঠল নাবিকের। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী, তাই লটারির তোয়াক্কা না-করে খালিহাতেই হেলমারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছে গেলাম আমি, হেলমারকে সাহায্য করার ইচ্ছা নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম নাবিকের পা। নৌকাটা দুলে উঠল তখন, হোঁচট খেল নাবিক লোকটা। গানওয়েলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা দু'জন। তারপর নৌকার কিনারা থেকে পানিতে পড়ে ডুবে গেল। ওদেরকে ডুবে যেতে দেখে হেসে ফেললাম নিজের অজান্তেই।

তারপর কতক্ষণ ধরে জানি না, নৌকার একদিকে শুয়ে ভাবছিলাম শরীরে শক্তি থাকলে সাগরের পানি খেতাম; ফলে পাগল হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি মরতে পারতাম। হঠাৎ দিগন্তের কাছে দেখি একটা মাস্তুল, এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। আগ্রহ বোধ করলাম না, কারণ ধরেই নিয়েছিলাম মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার, মনের উল্টোপাল্টা ভাবনাগুলোই দেখা দিচ্ছে চোখের সামনে।

ঢেউ-এর সঙ্গে তাল রেখে আমার মাথাটাও উঠছে-নামছে, দিগন্তের ওই মাস্তুলটাও নাচছে একই তালে। মনে হচ্ছে অনন্ত কাল ধরে শুয়ে আছি, আর ওই স্কুনারটা (ওটা আসলে ছোট একটা জাহাজ, গলুই আর পিছনের দিকটা স্কুনারের মতো করে সাজানো হয়েছে) আমার দিকে এগিয়ে আসছে তো আসছেই। বাতাস পড়ে গেছে, তাই এঁকেবেঁকে একবার এদিক তো পরেরবার ওদিক দিয়ে আসছে জাহাজটা। দৃষ্টি আকর্ষণ করার

চিন্তা মাথায় এল না, কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি জ্ঞান হারাতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। জাহাজের পাশের দিকটা চোখে পড়ল একবার, তারপর জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি শুয়ে আছি ছোট একটা কেবিনে।

এর আগেও বোধহয় জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলাম একবার–আমাকে গ্যাংওয়েতে তোলার সময়ে। লাল চুল আর তিলেভরা অপ্রসন্ন একটা মুখ বুলওয়াকের উপর থেকে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তখন। অস্বাভাবিক একজোড়া চোখের শ্যামলা একটা চেহারাও মনে আছে–খুব কাছ থেকে দেখছিল আমাকে। প্রথমে ভাবলাম দুঃস্বপ্ন দেখছি, কিন্তু পরে আবারও দেখলাম চেহারাটা। কোনো একজাতের তরল পদার্থ ঢেলে দেওয়া হলো আমার মুখের ভিতরে, তারপর আর কিছু মনে নেই।

দুই

ছোট আর অগোছালো একটা কেবিনে আছি আমি। হালকা হলুদ চুল আর খড়রঙা গোঁফওয়ালা, নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়া এক যুবককে দেখি আমার কব্জি ধরে বসে আছে আমার পাশে। পুরো এক মিনিট একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা, কোনো কথা বললাম না। যুবকের ছলছল চোখদুটো ধূসর, আশ্চর্যরকম অভিব্যক্তিহীন। উপর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল এমন সময়, মনে হলো লোহার খাট টানছে কেউ। বড় কোনো

জন্তুর ক্রুদ্ধ নিচু গর্জনও শুনতে পেলাম। তখনই কথা বলে উঠল যুবক, 'কেমন লাগছে এখন?'

মনে হয় বলেছিলাম ভালো। নিজের কণ্ঠ নিজেই শুনতে পারছিলাম না আসলে।

আমার চেহারা দেখে বুঝে নিল যুবক কী জানতে চাচ্ছি আমি। বলল, 'একটা নৌকায় পাওয়া গেছে আপনাকে। খেতে না-পেয়ে মরতে বসেছিলেন। নৌকায় গায়ে লেডি ভেইন নামটা লেখা আছে দেখলাম। গানওয়েলের উপর রক্তের ছাপও দেখেছি।'

নিজের হাতের দিকে তাকালাম। ময়লা, কঙ্কালসার। নৌকার ঘটনাগুলো মনে পড়ল।

'এটা খেয়ে নিন,' বরফ-দেয়া টকটকে লাল কোনো একজাতের তরল পদার্থ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল যুবক।

জিনিসটা খেতে রক্তের মতো লাগল। কিছুটা শক্তি পেলাম শরীরে।

'আপনার কপাল ভালো,' বলল সে, 'এমন একটা জাহাজ আপনাকে উদ্ধার করেছে যেখানে একজন ডাক্তার আছে।'

'কী জাহাজ এটা?' ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে বললাম।

'বলতে পারেন বাণিজ্যজাহাজ। ক্যালাও থেকে রওনা হয়েছে। আমি সাধারণ এক যাত্রী। জাহাজের ক্যাপ্টেন-কাম-মালিকের নাম ডেভিস, গাধাটা সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে—সুতরাং জাহাজের আসল নাম কী, কবে কোথায় তৈরি হয়েছে কিছুই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। আমিও ওসব জানতে চাইনি কারও কাছে কখনও। নামটা জানি শুধু—আইপেকাকুয়ানহা।'

উপরের শব্দটা শুনতে পেলাম আবার। প্রথমে ক্রুদ্ধ একটা

গর্জন, তারপর একজন মানুষের কণ্ঠ, এরপর কী বলে যেন অভিশাপ দিল আরেকজন।

'আরেকটু হলে মরেই যেতেন আপনি,' বলে চলল যুবক, 'ওষুধপানি খাইয়ে বাঁচিয়েছি আপনাকে। আপনার হাতের এই ক্ষতগুলো খেয়াল করেছেন? ইনজেকশন। টানা প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা বেহুঁশ ছিলেন।'

ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কয়েকটা কুকুর, মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল আমার। জিজ্ঞেস করলাম, 'শক্ত খাবার খেতে পারবো?'

'পারবেন। মাংস রান্না করা হচ্ছে আপনার জন্য। কিন্তু...' একমুহূর্ত দ্বিধা করল যুবক, 'আপনার আসলে কী হয়েছিল জানতে ইচ্ছা করছে খুব। মানে ওই নৌকায় একা...। উফ্! কুকুরগুলোর যন্ত্রণায় আর পারলাম না।' ঝড়ের বেগে কেবিন ছেড়ে বের হয়ে গেল সে।

একটু পর শুনলাম কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে, কিন্তু অন্য লোকটা কী বলছে বুঝলাম না ঠিকমতো। ঘুষির শব্দ শুনলাম বলেও মনে হলো একবার। কুকুরগুলোকে ধমক দিল যুবক, তারপর ফিরে এল কেবিনে। দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'হ্যাঁ, এবার আপনার কাহিনিটা বলুন।'

আমার নাম বললাম, প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করি জানালাম।

আগ্রহান্বিত মনে হলো ওকে। 'বিজ্ঞান নিয়ে অল্পবিস্তর পড়েছি আমি নিজেও। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে জীববিজ্ঞান ছিল আমার–কেঁচোর ডিম্বাশয় আর শামুকের র‍্যাডুলা বের করেছি। খোদা! দশ বছর আগের কথা এসব। যাই হোক, আপনি বলে যান।'

কাহিল লাগছিল, তাই সংক্ষেপে বললাম সব। মনে হলো

ঘটনাটা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে যুবক। আমার বলা শেষ হওয়ামাত্র প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে ফিরে গেল সে, জীববিজ্ঞানে কী পড়েছে না-পড়েছে সেসব নিয়েও বকবক করল কিছুক্ষণ। লন্ডনের টটেনহাম কোর্ট রোড আর গাওয়ার স্ট্রিট নিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল আমাকে। বলল ডাক্তারি পড়ত একসময়, কিন্তু ছাত্র হিসেবে আহামরি কিছু ছিল না। বরং গানের দোকানগুলোতে ঘুরঘুর করত বেশি। মজার মজার কয়েকটা কাহিনিও শোনাল।

'বাদ দিন এসব,' বকবকানির শেষপর্যায়ে বলল সে, 'দশ বছর আগের কথা বলে আর কী লাভ! ভুল করেছি—খেসারত দিতে গিয়ে ফুরিয়ে গেছি একুশ বছর বয়সের আগেই। এখন আর কিছুই আগের মতো নেই।...যাই, দেখি আসি বাবুর্চি কী করছে।'

গর্জনটা শুরু হলো আবার হঠাৎ করে। এত জোরে যে, চমকে উঠলাম।

পিছু ডাকলাম তখন যুবককে, ব্যাপার কী জানতে চাইলাম। কিন্তু কিছু না-বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সে। কিছুক্ষণ পর সেদ্ধ মাংস নিয়ে ফিরে এল আবার। গন্ধে আমার খিদে এত বেড়ে গেল যে, উপরের তর্জন-গর্জন ভুলে গেলাম।

খেলাম আর ঘুমালাম পুরো একটা দিন। শক্তি ফিরে পেলাম কিছুটা, বাঙ্ক থেকে নেমে স্কাটলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম। বাইরে তাকিয়ে মনে হলো যেন সমুদ্রটা পিছনে ফেলে এগোচ্ছি আমরা। বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকেই যাচ্ছে আমাদের জাহাজ। মন্টগোমারি, হালকা হলুদ চুলের সেই যুবক, এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বলতে গেলে উলঙ্গ আমি, তাই কিছু কাপড় চাইলাম ওর কাছে। মোটা কাপড়ের কয়েক প্রস্থ পোশাক দিল সে আমাকে। মন্টগোমারি লম্বা-চওড়া, তাই ওর কাপড়গুলো

ঢলঢল করতে লাগল আমার শরীরে।

'মাতাল হয়ে নিজের কেবিনে পড়ে আছেন ক্যাপ্টেন,' অপ্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ বলল সে।

'জাহাজটা যাচ্ছে কোথায়?'

'যাওয়ার কথা তো হাওয়াই-এ। তবে আগে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

'কোথায়?'

'একটা দ্বীপে। ওখানেই থাকি আমি। যতদূর জানি, কোনো নাম নেই দ্বীপটার।' নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল ওর, কেন যেন মনে হলো বোকার ভান করে আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল সে। আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

তিন

কেবিন ছেড়ে বের হলাম আমরা। কম্প্যানিয়নে, মই-এর উপরে, আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, হ্যাচওয়ে দিয়ে উঁকি দিয়ে কী যেন দেখছে। লোকটা কদাকৃতির— বেঁটে, মোটা, পিঠটা কুঁজো, ঘাড়ে লোম ভরা, দু'কাঁধের মধ্যে যেন ডুবে গেছে মাথাটা, চুল অস্বাভাবিক ঘন আর কালো। নীলরঙা সাধারণ একটা পশমী কাপড় পরে আছে সে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর জোরে গর্জে উঠল কুকুরগুলো, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে সরে এল লোকটা। আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যেত আমার

সঙ্গে, হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওকে। জন্তুর মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে দাঁড়াল সে।

চমকে উঠলাম কুৎসিত কালো ঝুলেপড়া চেহারাটা দেখে। মনে হলো মানুষ নয়, যেন পশুর মুখোশ পড়া কাউকে দেখছি সামনে। অর্ধেক খোলা মুখের ভিতরে দেখা যাচ্ছে বড় বড় দাঁত, অত বড় দাঁত অন্তত কোনো মানুষের মুখে দেখিনি কখনও। চোখের প্রান্তগুলো রক্তের মতো লাল, লালচে-বাদামি মণির চারপাশে সাদা বৃত্ত দেখা যায় কি যায় না। চেহারায় কৌতূহল আর উত্তেজনার ছাপ।

'এই শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠল মন্টগোমারি, 'সামনে থেকে সরিস্ না কেন?'

কিছু বলল না কালো চেহারার লোকটা, সরে দাঁড়াল। ওর চেহারার উপর থেকে চোখ না-ফিরিয়েই কম্প্যানিয়ন ধরে এগিয়ে চললাম আমি। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল মন্টগোমারি, তারপর কালো চেহারার লোকটাকে বলল, 'এখানে কোনো কাজ নেই তোর। সামনে যা।'

জড়সড় হয়ে গেল লোকটা। ক্ষীণ, ভাঙা কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল, 'ওরা...সামনে যেতে দেবে না আমাকে।'

'সামনে যেতে দেবে না!' গর্জে উঠল মন্টগোমারি, 'আমি বলছি সামনে যা!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, তারপর আমার পিছু পিছু মই বেয়ে উঠে এল উপরে।

হ্যাচওয়ের অর্ধেক মতো গিয়ে থামলাম আমি, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পিছনে। কালো চেহারার কুৎসিত আর অদ্ভুত সেই লোকটার কথা যতই ভাবছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। অমন বীভৎস আর অস্বাভাবিক চেহারা আগে কখনও দেখিনি। এখন আশ্চর্য

হলেও কেন যেন মনে হচ্ছে ওই মুখ, ওরকম অঙ্গভঙ্গি আগেও দেখিছি। পরে অবশ্য মনে হয়েছিল আমাকে যখন জাহাজে তোলা হচ্ছিল তখন ওই লোকটাকেই দেখেছিলাম। কিন্তু অমন অদ্ভুত একটা চেহারা দেখার পর ভুলে গেলাম কীভাবে ভেবে পেলাম না।

স্কুনারটার অতি-নোংরা ফ্লাশডেকে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকালাম। এর আগে আওয়াজ শুনেছি, সুতরাং যা দেখলাম সেটা অপ্রত্যাশিত বলা যাবে না। প্রধান মাস্তুলের সঙ্গে শিকল দিয়ে কয়েকটা স্ট্যাগহাউন্ড বাঁধা, আমাকে দেখামাত্র ঘেউ ঘেউ করতে করতে লাফাতে শুরু করল চামড়ার ফিতার মুখোশ পরানো কুকুরগুলো। তিন নম্বর মাস্তুলের পাশে লোহার একটা ছোট খাঁচা রাখা, সেটার ভিতরে বিশাল এক পুমা। খাঁচাটা এত ছোট যে, একদিকে মুখ করে বসে আছে জন্তুটা, ঘুরতে পর্যন্ত পারছে না। তারের জাল দিয়ে একপ্রান্ত ঢাকা বড় বড় কয়েকটা বাক্স দেখলাম স্টারবোর্ডের বুলওয়াকের নীচে, সেগুলোর ভিতরে বেশ কিছু খরগোস। সামনের দিকে আরেকটা ছোট খাঁচা, সেটাতে ঠেসেঠুসে কোনোরকমে ভরা হয়েছে একটা লামা। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক।

তালি দেয়া, নোংরা পালগুলো ফুলে উঠেছে বাতাসের ধাক্কায়। দেখে মনে হলো যতগুলো পাল ছিল জাহাজে সব খাটানো হয়েছে। আকাশ পরিষ্কার, পশ্চিমদিকে অর্ধেক নেমে গেছে সূর্য। বিশাল সব ফেনিল ঢেউ বয়ে চলেছে জাহাজের সঙ্গে। হুইলের লোকটাকে ছাড়িয়ে ট্যাফরেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। দেখলাম, স্টার্নের নীচ থেকে সফেন জলরেখা বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জাহাজের গমনপথে। ঘুরলাম, আরেকবার ভালোমতো দেখলাম জাহাজটা।

'এই জাহাজে করে কি বন্যপ্রাণী চালান করা হয়?' জিজ্ঞেস করলাম মন্টগোমারিকে।

'দেখে তো তা-ই মনে হয়।'

'কে কী করে এসব জন্তু-জানোয়ার দিয়ে? ব্যবসা? দক্ষিণ সমুদ্রের কোথাও নিয়ে গিয়ে এগুলোকে বেচবেন নাকি ক্যাপ্টেন?'

'দেখে তো তা-ই মনে হয়,' একই কথা দ্বিতীয়বার বলে ঘুরল মন্টগোমারি, স্টার্নের নীচ থেকে বের হওয়া জলরেখা দেখতে লাগল আবার।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার আর ভয়াবহ কিছু গালিগালাজ শোনা গেল কম্প্যানিয়ন হ্যাচওয়ে থেকে। কালো চেহারার কুৎসিত লোকটা ছুটে বের হয়ে এল। ওর ঠিক পিছনেই বের হলো সাদা ক্যাপ পরা বিশাল এক লালচুলো লোক। আমাকে দেখে এতক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কুকুরগুলো; কালো চেহারার লোকটাকে দেখামাত্র ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল ওগুলো-গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে এত জোরে লাফালাফি শুরু করল, যেন পারলে শিকল ছিঁড়ে ফেলে। ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে কী করবে ভেবে না-পেয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে, এই সুযোগে কাছে এসে ওর শোল্ডারব্লেডে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারল লালচুলো। মুখ থুবড়ে ডেকের উপর পড়ে গেল কুৎসিত লোকটা। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে আবার পড়ল, গড়াগড়ি খেতে লাগল কুকুরগুলোর নাগালের মধ্যে। ছেঁকে ধরল ওকে জন্তুগুলো। তবে ওর কপাল ভালো-মুখোশ থাকায় ওকে কামড়াতে পারছে না কুকুরগুলো। কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল লালচুলো, একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে টলতে লাগল। মনে হলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোথায় যাবে-কম্প্যানিয়ন হ্যাচওয়েতে, নাকি কুৎসিত লোকটার দিকে।

কয়েক কদম সামনে এগোল মন্টগোমারি, চেঁচিয়ে থামতে বলল লালচুলোকে। ফোরক্যাসলে উদয় হলো দু'জন নাবিক। অদ্ভুত কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে কুকুরগুলোর পায়ের নীচে গড়াগড়ি খেতে লাগল কালো চেহারার লোকটা। ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল না কেউ। কুৎসিত লোকটার উপর চড়ে বলতে গেলে নাচছে ধূসরদেহী কুকুরগুলো; মুখ নামিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে কামড়াতে, মুখোশের কারণে সুবিধা করতে পারছে না। লোকটার দুরাবস্থা দেখে চেঁচাচ্ছে ফোরক্যাসলের নাবিক দু'জন, যেন চমৎকার কোনো খেলা চলছে ডেকে। রাগে চেঁচিয়ে উঠল মন্টগোমারি, লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সামনে, পিছন পিছন গেলাম আমিও। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল কালো চেহারার লোকটা, কুঁজো হয়ে মাস্তুলের দড়ি ধরে টলতে টলতে এগোল সামনের দিকে; হাঁপাচ্ছে; ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুকুরগুলোর দিকে। দেখে মজা পেল লালচুলো, সন্তুষ্টির হাসি হাসল।

ওর কনুই আঁকড়ে ধরল মন্টগোমারি, জোরালো গলায় বলল, 'দেখুন, ক্যাপ্টেন, কাজটা ভালো হলো না।'

ওর পিছনে দাঁড়ালাম আমি। নিষ্প্রভ, গম্ভীর, অর্ধমাতাল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কী ভালো হলো না?' ঘুম ঘুম চোখে মন্টগোমারির চেহারাটা দেখলেন তিনি এক মিনিট, তারপর আবার বললেন, 'শয়তান ডাক্তার!'

হঠাৎ টান মেরে কনুই ছাড়িয়ে নিলেন তিনি, তিনবারের চেষ্টায় প্যান্টের পকেটে ঢুকালেন মেচেতায় ভরা হাতদুটো।

'লোকটা একজন যাত্রী,' বলল মন্টগোমারি, 'ওর গায়ে হাত তুলবেন না আর।'

'জাহান্নামে যাও,' চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, টলতে টলতে

সরে গেলেন একপাশে। 'জাহাজ আমার, কাজেই আমি যেটা যেভাবে বলবো সেটা সেভাবেই করতে হবে।'

ক্যাপ্টেনের দিকে এগোল মন্টগোমারি। 'দেখুন, ক্যাপ্টেন, সে আমার লোক। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা আর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা এক কথা। খেয়াল করেছি, জাহাজে চড়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে ওকে।'

নেশার ঘোরে একটা মিনিট চুপ করে থাকলেন ক্যাপ্টেন। তারপর আবার বললেন, 'শয়তান ডাক্তার!'

একজাতের লোক আছে যাদের রাগ অদম্য, যার উপর রেগেছে তাকে ক্ষমা করতে পারে না কখনও, বরং দিন দিন বাড়তেই থাকে রাগ—মন্টগোমারি এই জাতের। ক্যাপ্টেনের দিকে ওকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে টের পেলাম ব্যাপারটা। বললাম, 'লোকটা মাতাল, ওকে এখন বুঝিয়ে লাভ নেই।'

ঝুলেপড়া ঠোঁটটা কুৎসিতভঙ্গিতে বাঁকাল মন্টগোমারি। 'হারামজাদা মাতাল থাকে না কখন? কিন্তু যাত্রীদের যাকে-খুশি-তাকে, যখন-খুশি-তখন ধরে পেটাবে, আর মাতাল ছিল বলে আমি মাফ করে দেবো?'

'আমার জাহাজ,' কাঁপা কাঁপা হাত তুলে খাঁচাগুলো দেখালেন ক্যাপ্টেন, 'ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল। দেখো কী অবস্থা হয়েছে এখন। আর যাত্রী যদি হয় তোমার ওই কুকুরমুখোটার মতো...'

'জাহাজে জন্তুজানোয়ার নেয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম আগেই,' ক্যাপ্টেনকে থামিয়ে দিয়ে বলল মন্টগোমারি, 'তখন তো আপত্তি করেননি আপনি?'

'তোমার ওই দ্বীপে যেতে রাজি হয়েই তো সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছি। জাহান্নামের মতো ওরকম একটা দ্বীপে এতগুলো জন্তুজানোয়ার দিয়ে কী করবে তুমি শুনি? আর তোমার ওই

কুকুরমুখোটা? ওটা আবার মানুষ নাকি? আমার তো মনে হয় পুরো পাগল। যাত্রী হয়েছে বলে কি পুরো জাহাজ কিনে নিয়েছে? এত জায়গা রেখে জাহাজের পিছনদিকে ঘুরঘুর করছিল কেন?'

'বেচারা ডেকে এলেই তো আপনার নাবিকরা ওকে খেপায়, হাসিঠাট্টা করে ওকে নিয়ে। কতক্ষণ সহ্য করবে সে?'

'খুব ভালো করে! ওরকম কুৎসিত একটা শয়তানকে খেপাবে না তো কি চুমু দেবে? আমার লোকরা একদম সহ্য করতে পারে না ওকে। আমিও ওকে দু'চোখে দেখতে পারি না। তোমাকেও না।'

মুখ ঝামটা মারল মন্টগোমারি, 'দেখতে পারুন বা না-পারুন, ওকে আর ঘাঁটাবেন না বলে দিলাম।' ঘুরে দাঁড়াল সে।

কিন্তু ঝগড়া করার ইচ্ছা পেয়ে বসেছে ক্যাপ্টেনকে। উঁচু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আরেকবার যদি জাহাজের পিছনদিকে যায় সে, ওর নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলবো আমি। আমাকে কী করতে হবে না হবে সে-ব্যাপারে বলার তুমি কে? আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন–ক্যাপ্টেন আর মালিক। আমার মুখের কথাই এখানে আইন। যা বলবো সেটাই করতে হবে। একটা লোক, তার চাকর আর কিছু জন্তুজানোয়ারকে আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া আর ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছি আমি; একটা পাগল শয়তান আর একটা গর্দভ ডাক্তারকে নয়...'

পাঁই করে ঘুরল মন্টগোমারি, রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। এক পা আগে বাড়ল সে। খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মন্টগোমারিকে থামানোর জন্য বললাম, 'লোকটা মাতাল।'

আবার মুখ খুললেন ক্যাপ্টেন, এবার হয়তো আগের চেয়েও খারাপ কিছু বলতেন। 'চুপ করুন!' যতটা জোরে সম্ভব ধমক

দিয়ে থামিয়ে দিলাম তাঁকে। অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, মন্টগোমারিও থমকে গেল। হয়তো মারামারি শুরু করে দিত দু'জন, আমার ধমকের কারণে থেমে গেল সেটা।

সম্ভাব্য সংঘর্ষটা থামাতে পেরে খুশিই হলাম, যদিও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না আমার উপর মাতাল ক্যাপ্টেনের মনোভাব এ-ঘটনার পর থেকে কীরকম হবে। আসলে ক্যাপ্টেনের ঔদ্ধত্য দেখে সামলাতে পারিনি নিজেকে; ওই জাহাজে আমি সঙ্গতিহীন একজন আশ্রিত মাত্র, ভাড়া দেয়ারও সামর্থ্য নেই ভুলে গিয়ে খেপে উঠেছিলাম। তবে যা-ই হোক, মারামারিটা ঠেকাতে পেরেছি এটাই বড় কথা।

ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিটা পাল্টে গেল আস্তে আস্তে, আমার উপর রাগে ফেটে পড়লেন তিনি। মুখে যা আসে বলতে লাগলেন। জানি রাগলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না, আর ক্যাপ্টেন তো পাঁড় মাতাল একটা। তাই তাঁর কোনো কথাই গায়ে মাখলাম না।

চার

সূর্যাস্তের পর স্থলভাগের দেখা পাওয়া গেল। থামল আমাদের জাহাজ, কিন্তু নোঙর ফেলল না। মন্টগোমারি বলল ওটাই নাকি ওর গন্তব্য। কিন্তু এত দূর থেকে তেমন কিছু দেখতে পারলাম না, নীলচে-ধূসর সাগরের উপর দিগন্তরেখায় অস্পষ্ট নীল একটা দাগ বলে মনে হচ্ছে দ্বীপটাকে। ওটা থেকে ধোঁয়ার লম্বা, সরু আর

এঁকাবাঁকা একটা রেখা প্রায় খাড়াভাবে উঠে মিশে যাচ্ছে আকাশে।

যখন দেখা গেল দ্বীপটা তখন ডেকে ছিলেন না ক্যাপ্টেন। বোঝার শক্তি নেই-একটানা অনেকক্ষণ আমাকে গালাগালি করেও যখন দেখলেন কোনো সাড়া নেই আমার তরফ থেকে, টলতে টলতে নীচে চলে গিয়েছিলেন তিনি। ভাবলাম, নিজের কেবিনে ঢুকেই মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছে মাতালটা।

ক্যাপ্টেনের বদলে জাহাজ চালায় মেট-হুইল ধরে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো মন্টগোমারির উপর খুব খেপে আছে সে। ওকে পাশ কাটিয়ে ডেকের রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা, কিন্তু এমন একটা ভাব করল সে যেন দেখতেই পায়নি আমাদের দু'জনের কাউকেই।

পরে একসঙ্গে বসে খেলামও আমরা। টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু মুখ গোমড়া করে বসে থাকল লোকটা, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। সন্দেহের দৃষ্টিতে বারবার মন্টগোমারিকে দেখছে লোকটা। কোথায় যাচ্ছে, জন্তুগুলো দিয়ে কী করবে-এসব ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলছে না মন্টগোমারিও। কৌতূহল বাড়ছে আমার, কিন্তু বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলাম না-দরকার হলে নিজে থেকেই সব বলবে সে।

পরে কোয়ার্টার ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দু'জন, টুকটাক কথা বলতে লাগলাম। একটা দুটো করে হাজার, পরে অসংখ্য তারায় ভরে উঠল আকাশটা। হলুদ একটা আলো জ্বলছে ফো'ক্যাসলে, সেখান থেকে অস্পষ্ট কিছু আওয়াজ ভেসে আসছে কখনও কখনও, মাঝেমধ্যে আবার শুনতে পাচ্ছি জন্তুগুলোর নড়াচড়ার শব্দ। গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে পুমাটা, জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে আমাদেরকে। অন্ধকারে কালো একটা স্তূপের মতো

লাগছে ওটাকে।

সিগার বের করল মন্টগোমারি। নিজে ধরাল, আমাকেও দিল একটা। বেদনাভরা কণ্ঠে লন্ডনের গল্প শোনাচ্ছে সে আমাকে, শহরটার কোথায় কী পরিবর্তন হয়েছে জানতে চাচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে লন্ডনে বেশ ভালোই ছিল সে, কিন্তু কোনো কারণে হঠাৎ করেই শহুরে জীবন থেকে আলাদা হয়ে গেছে বেচারা। এটা-সেটা নিয়ে আমিও বকবক করলাম কিছুক্ষণ। জানি না কেন ওর ব্যাপারে অদ্ভুত একটা ধারণা আপনা থেকেই জন্মে গেল আমার মনে। আমাদের পিছনে একটা খুঁটির উপর ঝুলছে একটা লণ্ঠন—কথা বলতে বলতে, অস্পষ্ট সেই আলোয় আধখোলা চোখে বার বার দেখলাম ওর অদ্ভুত, ফেকাসে চেহারাটা। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালাম অন্ধকার সাগরের দিকে, যেখানে লুকিয়ে আছে ওর ছোট্ট সেই দ্বীপ।

কেন যেন মনে হলো, সমুদ্রের বিশালত্ব ফুঁড়ে শুধু আমাকে বাঁচানোর জন্যই এসেছিল মন্টগোমারি, কাল আবার হারিয়ে যাবে সে। পুরো ব্যাপারটা যতই গতানুগতিক হোক না কেন, খানিকটা চিন্তিত না-হয়ে পারলাম না। স্বীকার না-করে উপায় নেই, যেসব অস্বাভাবিকতা দেখছি ওর মধ্যে সেগুলো যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ওর মতো শিক্ষিত একজন লোক নাম-না-জানা ছোট্ট একটা দ্বীপে থাকে, সঙ্গে অতি-অদ্ভুত এক লোক আর হরেক রকমের পশু। ক্যাপ্টেনের সেই প্রশ্নটা ঘুরেফিরে বার বার মনে পড়তে লাগল, 'এতগুলো জন্তুজানোয়ার দিয়ে কী করবে তুমি শুনি?' কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন এমন ভান করল যেন জন্তুগুলো ওর নয়। আর ওর চাকরটার কথা তো বলাই বাহুল্য। সবকিছু একসঙ্গে হয়ে কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে মন্টগোমারিকে। হাজার ভেবেও কোনো কলকিনারা করতে পারছি না, আবার নিজে

থেকে কিছু বলতেও পারছি না।

লন্ডন নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হলো মাঝরাতের দিকে। বুলওয়াকের উপর ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, তারকালোকিত নিস্তব্ধ সমুদ্রের দিকে স্বপ্নিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে থাকলাম দু'জনে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুরে কিছুক্ষণ পর বললাম, 'আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।'

'কপাল,' উদাসী কণ্ঠে বলল মন্টগোমারি, 'সবই আসলে কপাল। সাহায্যের দরকার ছিল আপনার, আর সাহায্য করার মতো বিদ্যা আছে আমার পেটে। আপনাকে ইনজেকশন দিয়েছি আমি, খাইয়েছি–গবেষণার জন্য কোনো নমুনা যোগাড় করলে যা যা করি অনেকটা সেরকম। আসলে একঘেয়ে লাগছিল আমার, কিছু একটা করতে চাইছিলাম। আপনাকে দেখেই যদি বিষিয়ে উঠত আমার মন, তাহলে আজ আর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলতে হতো না।'

দমে গেলাম কিছুটা। 'যা-ই হোক...'

'ভাগ্য,' আমাকে বাধা দিয়ে বলে চলল সে, 'মানুষের জীবনে ভাগ্যটাই বড় কথা। এই যে আমি আজ লন্ডনের সব সুখসুবিধা ভোগ করার বদলে সভ্যজগৎ থেকে এত দূরে আছি–কেন? কারণ আর কিছুই না, এগারো বছর আগে কুয়াশাচ্ছন্ন এক রাতে, দশ মিনিট, মাত্র দশটা মিনিটের জন্য কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল আমার মাথাটা।'

'এলোমেলো?'

হাসল মন্টগোমারি। 'আজকের রাতটা যেন কেমন। সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে তারার আলো, কী বলতে কী বলছি আপনাকে নিজেও ঠিকমতো জানি না। আমি আসলে একটা গাধা,

তারপরও কেন যেন সবকিছু বলতে ইচ্ছা করছে আপনাকে।'

'যা বলবেন আমাকে, কথা দিলাম, কাউকে কোনোদিন বলবো না।'

শুরু করতে গিয়েও থেমে গেল সে, অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

'খুব গোপন ব্যাপার হলে বলার দরকার নেই। হয়তো জানলেও কিছু করতে পারবো না, জানা না-জানা হয়তো সমান কথা হবে আমার জন্য। তবে আপনি হয়তো কিছুটা স্বস্তি পেতে পারতেন।'

তবুও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না মন্টগোমারি। আবারও মাথা নাড়ল সে। বুঝলাম, অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিয়েছি বেচারাকে, নিজের উপরই বিরক্ত হচ্ছে সে। যে-কারণে ডাক্তারি পড়া বাদ দিয়ে লন্ডন ছেড়ে সভ্যজগৎ থেকে দূরে সরে আছে দীর্ঘদিন, বলি বলি করেও বলতে পারছে না কথাটা। কারণটা কী হতে পারে ভাবলাম, কিন্তু বুঝে উঠতে পারলাম না ঠিক, ভদ্রতার খাতিরে কৌতূহল না-দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।

ট্যাফরেইলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ কালো একটা মূর্তি, তারা দেখছে। চিনতে মোটেও অসুবিধা হলো না লোকটাকে—মন্টগোমারির অদ্ভুত সেই চাকর। আমি ঘুরে দাঁড়ানোমাত্র ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আমাকে, তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। একটা মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু যা দেখলাম, তাতে আমার বুকটা ধক করে উঠল।

হুইলের কাছের একটা খুঁটিতে ঝুলছে জ্বলন্ত একটা লণ্ঠন, আমাদের কাছেপিঠে আলোর একমাত্র উৎস সেটাই: অনুজ্জ্বল আলোয় মন্টগোমারির চাকর যখন তাকাল আমার দিকে, হালকা-সবুজ আভায় চকচক করে উঠল ওর চোখজোড়া। শুনেছি কোনো

কোনো মানুষের চোখ নাকি অন্ধকারে লালচে দেখায়, কিন্তু তখন জানতাম না সেটা। ব্যাপারটা পুরোপুরি অবাস্তব মনে হলো আমার, মনে হলো আকস্মিক এই চমকে আমার পুরো অস্তিত্ব যেন নড়ে গেছে–যত তুচ্ছই হোক না কেন ঘটনাটা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিলাম আস্তে আস্তে, ট্যাফরেইলের উপর ঝুঁকে থাকা গেঁয়ো কালো গুরুত্বহীন মূর্তিটাকে আগের মতোই স্বাভাবিক মনে হতে লাগল আবার, এবং হঠাৎ খেয়াল করলাম কী যেন বলছে মন্টগোমারি।

'...ঘুমাতে যাবো।'

জবাবে অপ্রাসঙ্গিক কী যেন বলেছিলাম ওকে। নীচে নামলাম আমরা, আমার কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল সে।

সেরাতে ভালো ঘুম হলো না আমার, খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। চাঁদ উঠল অনেক দেরিতে, সাদা একটা ভুতুড়ে চন্দ্ররশ্মি ঢুকে পড়ল কেবিনে, বাঙ্কের পাশে মেঝেতে অলক্ষুণে একটা অবয়ব তৈরি হলো। জেগে উঠল কুকুরগুলো হঠাৎ করেই, গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল, ভয়াবহ সেই শব্দে একটু পর পর ঘুম ভেঙে যেতে লাগল আমার। শেষপর্যন্ত ঘুমানোর আশা বাদ দিয়ে চোখ মেললাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম, ভোর হয়েছে মাত্র।

পাঁচ

চোখ কচলাতে কচলাতে ভাবছি কোথায় আছি, উপর থেকে হঠাৎ ভেসে এল কারও কর্কশকণ্ঠের চিৎকার। খালি পায়ে দ্রুত হেঁটে গেল কেউ, ভারী জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলতে লাগল, তীব্র একটা ক্যাচক্যাঁচ আওয়াজ শোনা গেল তারপর, সবশেষে শিকল টানার ঝনঝন শব্দ। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নেয়া হলো, বাড়ি খেয়ে ছলকে উঠল পানি, কেবিনের ছোট্ট জানালাটা ভেসে গেল ফেনায়িত হলদে-সবুজ ঢেউ-এ। বাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে দৌড় দিলাম ডেকের উদ্দেশে।

সূর্য তখন উঠছিল মাত্র। রাঙা আকাশের পটভূমিতে বিশাল পিঠ আর লালচুলের ক্যাপ্টেনকে দেখলাম মই বেয়ে উঠার সময়। আরও দেখলাম পুমাটাকে—জাহাজের তিন নম্বর মাস্তুলের কপিকলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে কেউ জন্তুটাকে; শূন্যে ঝুলছে সেটা, ঘুরছে লাটিমের মতো। একনজর দেখেই বুঝলাম খুব ভয় পেয়েছে অসহায় জন্তুটা, এমনভাবে পা ছুঁড়ছে যেন কোনোরকমে খাঁচায় ঢুকে আগের মতো জড়োসড়ো হয়ে থাকতে পারলে বাঁচে।

'সবগুলোকে নামিয়ে দে,' চেঁচিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'জাহাজটা সাফসুতরো হবে।'

এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন যে, তিনি না-

সরলে ডেকে যাওয়া সম্ভব না। টলতে টলতে কয়েক কদম সরে গেলেন তিনি, পিছন ফিরে তাকালেন, আমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তিনি যে এখনও মাতাল বুঝতে অসুবিধা হলো না।

'আরে, এই যে,' জড়ানো কণ্ঠে বোকার মতো বললেন ক্যাপ্টেন, 'মিস্টার, মিস্টার...'

'প্রেনডিক,' বললাম আমি।

'শালা, জাহান্নামে যা তুই। তোর নাম চুপ—মিস্টার চুপ। একদম চুপ করে থাকবি তুই, একটা কথাও যেন না-শুনি তোর মুখ থেকে।'

এখন কিছু বলা মানে ঝামেলা বাড়ানো। তাই সত্যিই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম নিজের জায়গায়। হাত তুলে গ্যাংওয়ের দিকে কী যেন দেখালেন ক্যাপ্টেন। তাকিয়ে দেখি, নীল ফ্ল্যানেলের নোংরা পোশাক পরা ধূসরচুলের বিশাল এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে মন্টগোমারি। বুঝলাম, এইমাত্র ডেকে এসেছে সে।

'ওই দিকে,' গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'মিস্টার চুপ, ওই দিকে যা, শালা!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মন্টগোমারি আর ওর সঙ্গের লোকটা।

'মানে?' ক্যাপ্টেনের কথা বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওই দিকে যেতে বলেছি আমি, শালা! গিয়ে সোজা নেমে যাবি জাহাজ থেকে। পুরো জাহাজটা পরিষ্কার করছি আমরা, নোংরা-আবর্জনা যা আছে সব সাফ করছি।...হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখনও? তাড়াতাড়ি যা!'

সত্যিই বোকার মতো তাকিয়ে থাকলাম ক্যাপ্টেনের দিকে। একটু পর মনে হলো, আমিও চেয়েছিলাম এরকম কিছু একটা

হোক। আমার মতো নিঃস্ব, পথ-হারানো একজন নৌযাত্রীর কাছ থেকে কী-বা আশা করতে পারেন ওরকম ঝগড়াটে আর মাতাল একজন ক্যাপ্টেন? এগিয়ে গেলাম মন্টগোমারির দিকে।

'আপনাকে নেয়া সম্ভব না,' এককথায় জানিয়ে দিল মন্টগোমারির সঙ্গের লোকটা, সংকল্পবদ্ধ চৌকোনা চেহারাটায় দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই।

'নেয়া সম্ভব না!' তাকালাম ক্যাপ্টেনের দিকে। 'দেখুন...'

'দেখাদেখির কিচ্ছু নেই!' বললেন ক্যাপ্টেন। 'চলে যাবি তুই। জন্তুজানোয়ার আর নরখাদকদের জন্য না আমার জাহাজ। মিস্টার চুপ, তাড়াতাড়ি নাম্—সঙ্গে তোর বন্ধুবান্ধবদেরও নিয়ে যা। এই দ্বীপের সঙ্গে আমার হিসাবকিতাব সারাজীবনের জন্য শেষ। অনেক হয়েছে, আর না।'

'কিন্তু, মন্টগোমারি...' মিনতি করলাম।

নীচের ঠোঁট বাঁকাল সে, পাশে দাঁড়ানো ধূসরচুলের লোকটাকে উদ্দেশ্য করে মাথা নাড়ল। চোখের ভাষায় জানিয়ে দিল নিজের অক্ষমতার কথা।

ধূসর চুলের লোকটাকে বললাম আমাকে দ্বীপে নিয়ে যেতে, রাজি হলো না সে। ক্যাপ্টেনকে বললাম ডেকে থাকতে দিতে হবে আমাকে, জবাবে আঙুল তুলে রেলিং দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এখানেই নামবি তুই, ওরা তোকে নিক্ বা না-নিক্। কোন্ আইনের জোরে জাহাজে থাকতে চাস্ তুই? আমি এই জাহাজের রাজা, আমার কথাই আইন।' আমার পক্ষে কথা বলবে—এই আশা করে তাকালাম মন্টগোমারির দিকে, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করল না সে। বেশ কয়েকজন নাবিককে দেখলাম ঘুর ঘুর করছে কাছেপিঠে, সাহায্যের আবেদন জানালাম ওদের কাছে, শুনে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা যেন বধির সবাই।

অনুনয়-বিনয়ে কাজ হবে না বুঝতে পেরে শেষপর্যন্ত মুখে-যা-আসে তা-ই বলে ভয় দেখাতে লাগলাম ক্যাপ্টেনকে। ক্ষ্যাপার মতো চেঁচাতে চেঁচাতে কণ্ঠ ভেঙে গেল আমার, আকস্মিক ভাবাবেগের প্রাবল্য সামলাতে না-পেরে বোধহয় স্নায়বিক বিকারে আক্রান্ত হলাম, জাহাজের পিছনদিকে গিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম একটানা।

কতক্ষণ কেটে গেল বলতে পারবো না, হঠাৎ দেখি জাহাজ "পরিষ্কার" করার কাজ অনেকখানি করে ফেলেছে নাবিকরা। পরিষ্কার মানে মন্টগোমারির মালপত্র আর জন্তুজানোয়ারগুলোকে জাহাজ থেকে নামানো। দুই লাগের বড় একটা লঞ্চ দেখলাম থেমে আছে স্কুনারের পাশে, মন্টগোমারির "রকমারি" লাগেজ তোলা হচ্ছে সেটাতে। কিন্তু যারা তুলছে তাদেরকে দেখতে পেলাম না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না লঞ্চটা। মন্টগোমারি বা ওর সঙ্গী সেই ধূসরচুলের লোকটা বোধহয় ভুলেই গেছে ডেকে আছি আমি। মাল নামাচ্ছে চার-পাঁচজন নাবিক; কখনও ওদেরকে সাহায্য করছে ওরা দু'জন, আবার কখনও আদেশ দিচ্ছে। টলতে টলতে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন, মাল খালাসের কাজে যতটা না সহযোগিতা করছেন তারচেয়ে বেশি মাতব্বরি ফলাচ্ছেন।

হতাশায় ছেয়ে গেছে আমার মন; এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছি যে, ইচ্ছা করছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলি। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। নাবিকদের কাজ দেখতে দেখতে নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে বরং হেসে ফেললাম দু'-একবার। ক্ষুধা আর রক্তস্বল্পতায় শক্তি বলতে গেলে নেই আমার শরীরে; স্পষ্ট বুঝতে পারছি ক্যাপ্টেন যদি আমাকে জাহাজ থেকে তাড়িয়ে

দিতে চান তাহলে ঠেকাতে পারবো না, আবার মন্টগোমারি বা ওর সঙ্গীর উপরও জোর খাটাতে পারবো না। তাই কপালে যা আছে হবে ভেবে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওদিকে লঞ্চে মাল তোলার কাজ এগিয়ে চলল একটানা, আমার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ একবার।

শেষ হলো কাজটা, তারপর হঠাৎ জোরে টান দিল কেউ আমাকে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম যথাসম্ভব, কিন্তু দুর্বলদেহে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। বুঝলাম, গ্যাংওয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। লঞ্চের অনেকখানি দেখতে পেলাম এবার। বাদামি চেহারার অদ্ভুত কতগুলো লোককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্টগোমারি। মালপত্রে বোঝাই হয়ে গেছে লঞ্চটা, যত জলদি পারে জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। স্কুনার আর লঞ্চের মাঝখানে সবুজ পানির চওড়া একটা ফাঁক দেখতে পেলাম, মাথা যাতে নীচের দিকে দিয়ে পড়তে না-হয় সেজন্য ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার দুর্দশা দেখে অবজ্ঞায় চেঁচিয়ে উঠল লঞ্চের বাদামিমুখো লোকগুলো, ওদেরকে সমানে গালি দিতে লাগল মন্টগোমারি। এদিকে টানতে টানতে আমাকে স্কুনারের পিছনদিকে, স্টার্নের কাছে নিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, মেট আর একজন নাবিক।

নীচে, জাহাজের সঙ্গে বাঁধা আছে "লেডি ভেইন"-এর নৌকাটা, পানিতে অর্ধেক ভর্তি সেটা এখন। রসদ তো দূরের কথা, একটা বৈঠাও নেই সেখানে। ইঙ্গিতে নামতে বললেন আমাকে ক্যাপ্টেন, সোজা মানা করে দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম ডেকের উপর—যা পারে করুক ওরা। স্টার্নে কোনো মই ছিল না বলে ওরা শেষপর্যন্ত একটা দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে জাহাজের কিনারা থেকে ঝুলিয়ে ওই নৌকায় নামিয়ে দিল।

তারপর কেটে দিল নৌকার দড়ি। স্রোতের ধাক্কায় জাহাজ থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলাম আমি। বোধশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি তখন, অসহায়ের মতো দেখলাম নাবিকরা সবাই মিলে মাস্তুলে পাল খাটাচ্ছে। বাতাস যেদিকে বইছিল সেদিকে ধীরে ধীরে ঘুরানো হলো জাহাজের মুখ, বাতাস লেগে পতপত করে ফুলে উঠল সবগুলো পাল। আমার দিকে কিছুটা কাত হয়ে গেল জাহাজটা, তারপর একসময় চোখের সামনে থেকে চলে গেল রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের অনেক অত্যাচার সওয়া কাঠামোটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম না, জাহাজটা কতদূর গেল জানতে ইচ্ছা করছিল না।

প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না কী হচ্ছে। গুটিসুটি মেরে ঢুকে গেলাম নৌকার আরেকটু ভিতরে, মাথা কাজ করছে না, ফাঁকা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি একদৃষ্টিতে। মাত্র কয়েকটা দিন আগে এই নৌকায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি, তবে তখন আর যা-ই হোক অর্ধেক ডুবিনি পানিতে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম, গলুই ছাড়িয়ে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অনতিদূরের জাহাজটার দিকে। দেখলাম ট্যাফরেইলে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছেন ক্যাপ্টেন। আবারও ঘাড় ঘুরালাম, এবার তাকালাম দ্বীপটার দিকে। ছোট থেকে ক্রমশ আরও ছোট হচ্ছে লঞ্চের কাঠামো, সৈকতের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সেটা।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম কেন আমাকে রেখে নিষ্ঠুরের মতো চলে গেল মন্টগোমারি। চেষ্টা না-করলে ওই দ্বীপে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আমার। তারমানে সে আসলে বোঝাতে চায়, আমাকে দ্বীপে নেয়নি সে, আমিই গিয়েছি।

খিদায় অস্থির লাগছে, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবো যে-কোনো সময়। শৈশবের পর যে-কাজ কখনোই করিনি, সেটাই শুরু

করলাম হঠাৎ-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু। হতাশায় মুষড়ে পড়ে বাড়ি মারলাম নৌকায়, লাথি মারলাম গলুই-এ। চিৎকার করে বললাম, 'আমাকে মেরে ফেলো, খোদা!'

ছয়

অসহায় অবস্থায় আমাকে ভাসতে দেখে বোধহয় দয়া হলো মন্টগোমারির। স্রোতের ধাক্কায় পুবদিকে সরে যাচ্ছিল আমার নৌকা, দ্বীপের দিকে তির্যকভাবে এগোচ্ছিলাম আমি; যখন দেখলাম মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকেই আসছে লঞ্চটা, দারুণ স্বস্তি পেলাম। মালে বোঝাই লঞ্চটা আরেকটু কাছে আসার পর মন্টগোমারির সেই ধূসর-চুল আর চওড়া-কাঁধের সঙ্গীকে দেখতে পেলাম। কুকুরগুলো আর কয়েকটা প্যাকিংকেস নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে স্টার্নশিটে বসে আছে সে। আমাকে একদৃষ্টিতে দেখছে; কারও সঙ্গে কথাও বলছে না, এমনকী নড়ছেও না। লঞ্চের সামনের দিকে, পুমাটার কাছে বসে আছে মন্টগোমারির কালো-চেহারার সেই চাকর, ধূসরচুলোর মতোই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। জন্তুর মতো দেখতে আরও তিনজন দাঁড়িয়ে আছে পাশে, এদের দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে গলা ফাটিয়ে ফেলছে কুকুরগুলো। সাবধানে চালিয়ে লঞ্চটা আমার কাছে নিয়ে এল মন্টগোমারি, তারপর উঠে এসে ধরল নৌকার দড়ি। লঞ্চের

হাল ঘুরানোর হাতলের সঙ্গে বাঁধল সেটা—দ্বীপ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চায় আমাকে। আমাকে যে লঞ্চে তুলে নেবে সে-উপায় নেই, মালসামান আর লোকজনের কারণে তিল ধারণের জায়গা নেই ডেকে।

কিছুটা ধাতস্থ হয়েছি ইতোমধ্যে। আমাকে সম্ভাষণ জানাল মন্টগোমারি, জবাবে বললাম, আমার নৌকা ডুবে যাচ্ছে। আমাকে একটা বালতি দিল সে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্বীপের দিকে চলতে শুরু করল লঞ্চটা, টান পড়ল নৌকার দড়িতে, মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেয়ে কিছুটা পিছনে হেলে পড়লাম আমি। নৌকায় জমে থাকা পানি সেঁচতে লাগলাম বালতি দিয়ে। যখন আর একটুও পানি থাকল না, বালতিটা একপাশে রেখে দিয়ে আবার তাকালাম লঞ্চের যাত্রীদের দিকে।

ধূসর চুলের সেই লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে দেখছে এখনও, মনে হলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না আমার ব্যাপারে। চোখাচোখি হলো ওর সঙ্গে, চোখ নামিয়ে নিয়ে পায়ের কাছে বসে থাকা কুকুরগুলোর দিকে তাকাল সে। আগেই বলেছি শক্তিশালী গড়ন লোকটার, লম্বায় ছ'ফুট তো হবেই, এবার খেয়াল করলাম চেহারাও সুন্দর ওর। কিন্তু বুড়োদের মতো চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে। কোনার দিকে ঝুলে পড়েছে মুখটাও, ফলে কেমন একটা যুদ্ধংদেহী ভাব চলে এসেছে চেহারায়। নিচুকণ্ঠে মন্টগোমারিকে কী যেন বলল সে, শুনতে পেলাম না।

অদ্ভুত সেই তিনজন লোকের দিকে তাকালাম এরপর। ওদের চেহারাটা দেখলাম শুধু, এবং দেখামাত্রই কেন জানি না তীব্র বিরক্তি জাগল মনে। যতবারই দেখছি ওদেরকে, একই অনুভূতি হচ্ছে—বুঝতে পারছি না কারণটা কী। চামড়া বাদামি ওদের, হাতে-পায়ে এমনকী আঙুলেও পট্টির মতো সাদা সাদা নোংরা কী

সব যেন বেঁধে রেখেছে। আর শুধু পট্টিই না, কায়দা করে উষ্ণীষও পরেছে। আধখোলা চোখে তিনজনই দেখছে আমাকে। সামনের দিকে বের হয়ে এসেছে ওদের নীচের চোয়াল, চোখ জ্বলজ্বল করছে সবার, লম্বা সোজা কালো চুল লেপ্টে আছে চাঁদিতে অনেকটা ঘোড়ার চুলের মতো, বসে আছে এমন ভঙ্গিতে যেন যত জাতের মানুষ আছে সবার মধ্যে ওরাই সেরা। যথেষ্ট লম্বা তিনজনই, কিন্তু আমার সমান না কেউই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হলাম, ওদের সবারই উরু ছোট আর বাঁকানো।

লঞ্চের সামনের লাগ ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে কালো চেহারার সেই লোকটাকে, অন্ধকারে যার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। আমার চোখে চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে, কিন্তু একটু পর পর চোরাচাহনিতে দেখতে লাগল আমাকে। আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, বাদামি চামড়ার লোকগুলোও একই কাজ করছে—আমাকে দেখছে, কিন্তু যেই আমি তাকাচ্ছি অমনি আরেকদিকে তাকিয়ে এমন ভান করছে যেন আমি নেই ওদের সামনে। ভাবলাম, আমার মতো অচেনা একটা লোককে দেখে বোধহয় বিরক্ত হচ্ছে ওরা; তাই ওদের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকালাম দ্বীপের দিকে।

দ্বীপটা নিচু, গাছপালায় ভরা। তালগাছ চোখে পড়ে বেশি। এই জাতের তালগাছ আগে কখনও দেখিনি। সাদা সুতার মতো, চিকন বাষ্পের একটা রেখা দ্বীপের একদিক থেকে উঠে যাচ্ছে অনেক উপরে, তারপর ছড়িয়ে পড়ছে পালকের মতো। খেয়াল করলাম, চওড়া একটা উপসাগরে ঢুকে পড়েছি আমরা, নিচু একটা শৈলান্তরীপ দু'দিক থেকে ঘিরে রেখেছে উপসাগরটাকে। ধূসর বালিময় সৈকত আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে গিয়ে মিশেছে ঢালে,

সমুদ্রতল থেকে ষাট কি সত্তর ফুট উপরে। কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড় জন্মে আছে ঢালের এখানে-সেখানে। সৈকত থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট ভিতরে দেখা যাচ্ছে বর্গাকৃতির কতগুলো পাথর—যেন প্রকৃতি আপন খেয়ালে দেয়াল বানিয়েছে। পরে জেনেছিলাম প্রবাল আর ঝামাপাথরের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে ওসব পাথর। প্রাকৃতিক দেয়ালের উপরে ছাদ, যেন দেয়ালটার মাথা ঢেকে উঁকি দিয়ে দেখছে আমাদেরকে। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম, দূর থেকে যেটাকে প্রাকৃতিক দেয়াল বলে ভাবছি, সেটা আসলে কারও বাড়ি। ভাবলাম, মন্টগোমারি, ওর সঙ্গের ওই বিশালদেহী লোক এবং অদ্ভুত লোকগুলো সবাই মিলে বোধহয় একসঙ্গে থাকে ওই বাড়িতে।

পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না; তবে মনে হলো কিম্ভূতকিমাকার কিছু জন্তু যেন তাড়াহুড়ো করে ছুটে পালিয়ে গিয়ে লুকাল ঢালের ঝোপগুলোর ভিতরে। দ্বীপের আরও নিকটবর্তী হলাম আমরা, কিন্তু ওই জন্তুগুলোকে দেখতে পেলাম না আর।

সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা মাঝারি উচ্চতার, নিগ্রোদের মতো কালো চেহারা ওর। মুখটা বড়, ঠোঁট বলতে গেলে নেই। লম্বা লম্বা হাত, পা-দুটো বাঁকানো, পায়ের পাতা লম্বা আর সরু। পশুদের মতো মুখের অনেকখানি বের হয়ে আছে সামনের দিকে। আমাদেরকে একদৃষ্টিতে দেখছে সে, মন্টগোমারি আর ওর ধূসরচুলের সঙ্গীর মতো জ্যাকেট আর নীল পশমের প্যান্ট পরেছে। আরও কাছে এগোল লঞ্চ, তখন অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল লোকটা—সৈকতের এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

আদেশের সুরে কী যেন বলল মন্টগোমারি। সঙ্গে সঙ্গে

লাফিয়ে উঠল বাদামি-চামড়ার লোক তিনজন আর ধূসরচুলো, অদ্ভুত কায়দায় নামিয়ে নিল লাগদুটো। তীর ঘেঁষে বানানো ছোট একটা ডকে লঞ্চ ভিড়াল মন্টগোমারি, আমাদের দিকে ছুটে এল সৈকতের লোকটা। ডকটা ছোট হলেও যথেষ্ট লম্বা, জোয়ারের ঢেউ ঠেলে সেখানে ঢুকতে অসুবিধা হলো না আমার লংবোটের। লাফিয়ে সৈকতে নামল মন্টগোমারির অনুচররা। বালতি দিয়ে কায়দা করে লঞ্চের হাল থেকে নৌকার দড়ি খুলে নামলাম আমিও।

বাদামি চামড়ার লোক তিনজন আর সৈকতের সেই লোকটা মিলে মাল খালাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওদের বাঁকানো পা-গুলোর দিকে তাকিয়ে আরেকবার আশ্চর্য না-হয়ে পারলাম না। দেখলে মনে হয় ভুল জায়গায় সংযুক্ত হয়েছে পা-এর অস্থি, এই বিকৃতি নিয়ে কাজ তো দূরের কথা ঠিকমতো নড়াচড়া করাও সম্ভব না, কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় চলাফেরা করছে ওরা যেন কোনো সমস্যাই নেই।

মাঝে থেমেছিল, এখন আবার ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরগুলো। ওগুলোর চেইন হাতে নিয়ে সৈকতে নামল ধূসর চুলের লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে টান পড়ল সবগুলো চেইনে—জন্তুগুলো পারলে চেইন ছিঁড়ে লাফিয়ে পড়ে পা-বাঁকা লোকগুলোর উপর। নিজেদের মধ্যে অদ্ভুত কণ্ঠে কী যেন বলাবলি করল ওরা, সৈকতের লোকটাও বোধহয় ভিনদেশী ভাষায় কিছু বলল। খেয়াল করলাম, হাত তুলে লঞ্চের পিছনের দিকটা দেখাচ্ছে ওরা, স্তূপ করে রাখা কোনো কিছুর দিকে ইঙ্গিত করছে মনে হয়। কেন যেন মনে হলো ওদের এই অদ্ভুত ভাষা আগেও কোথাও শুনেছি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায়। ছটা কুকুরের চিৎকার ছাপিয়ে গর্জে উঠল ধূসরচুলোর কণ্ঠ, সমানে আদেশ দিতে লাগল সে। হাল ছেড়ে

সৈকতে নামল মন্টগোমারি, নিজের লোকদের নিয়ে মাল খালাসের কাজ শুরু করে দিল। খিদায় ভুগে আর রোদে পুড়ে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, ওদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পর আমার কথা মনে পড়ল ধূসর চুলের লোকটার। আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে, বলল, 'নাস্তা খেয়েছেন?'

ওর ঘন ভ্রূর নীচে ছোট কিন্তু অতিকালো চোখজোড়ায় উজ্জ্বল দীপ্তি। প্রশ্নের জবাবে আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠল সে, 'কিছু মনে করবেন না, দোষ আসলে আমারই–খেয়ালই ছিল না কথাটা। আমন্ত্রিত না-হলেও আপনি আমাদের মেহমান, আপনার আরাম-আয়েশের দিকে খেয়াল রাখা আমাদের কর্তব্য।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার চেহারার দিকে তাকাল সে। 'মন্টগোমারি বলল আপনি শিক্ষিত লোক, মিস্টার প্রেনডিক, বিজ্ঞান নিয়ে নাকি অল্পবিস্তর পড়াশোনা আছে আপনার। কথাটার মানে কী জানতে পারি?'

'রয়্যাল কলেজ অভ সাইন্সে কয়েক বছর পড়েছি আমি,' বললাম। 'জীববিজ্ঞান নিয়ে সামান্য গবেষণাও করেছি বেশ কিছুদিন।'

কথাটা শুনে ভ্রূ সামান্য উঁচু করল সে, শ্রদ্ধার সুরে বলল, 'ঘটনাক্রমে আমরাও জীববিজ্ঞানী। এই দ্বীপ আসলে... একধরনের... বায়োলজিকাল স্টেশন।' রোলারে উঠিয়ে পুমার খাঁচাটা টানছে বাদামি চামড়ার লোকগুলো, ঘাড় ঘুরিয়ে ওদেরকে দেখল সে, তারপর আবার বলল, 'আমরা বলতে আমি আসলে আমাকে আর মন্টগোমারিকে বুঝিয়েছি। যাই হোক, আপনি কবে ফিরে যেতে পারবেন বলতে পারছি না–বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ নেই আমাদের। দ্বীপের ধারেকাছে বছরে

একটা কি দুটো জাহাজ আসে, কোনো কোনো বছর তা-ও আসে না।' ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করল সে, সঙ্গীদের ছাড়িয়ে গিয়ে চড়ল ঢালে, তারপর প্রাকৃতিক সেই দেয়াল, মানে বাড়িটার আড়ালে চলে গেল একসময়।

অন্য লোকদের নিয়ে কাজ করছে মন্টগোমারি, ছোট চাকার একটা ঠেলাগাড়িতে স্তূপাকারে সাজাচ্ছে লঞ্চে করে আনা মালপত্র। খরগোসের খাঁচাগুলোর সঙ্গে এখনও লঞ্চে রয়ে গেছে লামাটা। মাল তোলা শেষ হলে ঠেলাগাড়ির অবস্থা দেখে ভাবলাম, কমপক্ষে এক টন হবে ওটার ওজন। কিন্তু সে-ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত মনে হলো না বাদামি চামড়ার লোকগুলোকে, ঠেলতে শুরু করে দিল ওরা। এতক্ষণে কাজে ক্ষান্ত দিল মন্টগোমারি, এগিয়ে এল আমার দিকে।

'আইপেকাকুয়ানহার ক্যাপ্টেনটা আসলে একটা শয়তান,' বলল সে, 'ভালোই হয়েছে ওই জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিতে হয়নি আপনাকে। নইলে ওই বজ্জাত ক্যাপ্টেন কী করত আপনার কে জানে।'

'আপনি আবার আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'জীবন বাঁচিয়েছি কি না এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। দ্বীপটা একটু ঘুরেফিরে দেখলেই বুঝতে পারবেন কী বোঝাতে চাচ্ছি আমি। আজব এক দ্বীপ এটা, আপনার জায়গায় আমি হলে সাবধানে চলাফেরা করতাম। তিনি...' ইতস্তত করল সে, এদিক-ওদিক তাকাল, কিছু একটা বলতে চেয়েও মত পাল্টে বলল, 'আসুন, খরগোসের খাঁচাগুলো একটু ধরুন।'

ওর পিছু পিছু গিয়ে চড়লাম লঞ্চে, অতিকষ্টে একটা খাঁচা নিয়ে এলাম তীরে। বালির উপর নামিয়ে রাখামাত্র খাঁচার দরজা খুলে দিল সে, অন্যদিক থেকে কিছুটা উঁচু করে ধরল খাঁচাটা

যাতে ভিতরে খরগোসগুলো বেরিয়ে যেতে পারে। গাদাগাদি করতে করতে বের হলো পনেরো-বিশটার মতো খরগোস, একটার উপর আরেকটা পড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল। জোরে হাততালি দিল মন্টগোমারি, সঙ্গে সঙ্গে সৈকত বরাবর লম্বা পদক্ষেপে ছুট লাগাল জন্তুগুলো।

'যা, তাড়াতাড়ি নাদুসনুদুস হ আর জনসংখ্যা বাড়া,' বলল মন্টগোমারি, 'মাংসের খুব অভাব আমাদের।'

পালাচ্ছে খরগোসগুলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, ব্র্যান্ডির একটা ফ্ল্যাস্ক আর কিছু বিস্কিট নিয়ে ফিরে এল ধূসরচুলের লোকটা। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে আগের চেয়ে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, 'খেয়ে নিন।'

কথা না-বাড়িয়ে খেতে শুরু করলাম তৎক্ষণাৎ। মন্টগোমারিকে সঙ্গে নিয়ে "খরগোস অবমুক্তকরণ" চালিয়ে গেল ধূসরচুলো। আরও বিশটার মতো খরগোস ছাড়ল ওরা। পুমার খাঁচার সঙ্গে খরগোসের আরও তিনটা বড় খাঁচা অবশ্য ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গেছে বাদামি চামড়ার লোকগুলো। বিস্কিট খাওয়া শেষ করলাম, কিন্তু ছুঁয়েও দেখলাম না ব্র্যান্ডির ফ্ল্যাস্ক–এ-জীবনে মদ খাইনি কখনও, খাওয়ার ইচ্ছাও নেই।

সাত

লামাটাকে নামানো হলো সৈকতে, ওটার পিছু পিছু বাড়িটার দিকে

এগোলাম আমি। এতক্ষণ আমার পিছনে ছিল মন্টগোমারি, এবার আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল কিছুটা, বাড়ির ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করল আমাকে। কেন মানা করল বুঝলাম না। সামনে তাকিয়ে দেখি মালপত্র সব বাড়ির বাইরেই রাখা আছে। এমনকী পুমার খাঁচাটাও। ভিতরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে জন্তুটা।

মাল খালাসের কাজ শেষ, লঞ্চটাকে অনর্থক ভাসিয়ে রেখে লাভ নেই–তাই সেটাকে টেনে সৈকতে তুলতে শুরু করল মন্টগোমারির অনুচররা। ধূসর চুলের লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে এল এমন সময়, মন্টগোমারিকে বলল, 'আমাদের এই...অনাহূত মেহমানকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো?'

'আগেও বলেছি আপনাকে, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ভদ্রলোক,' ঘুরিয়ে জবাব দিল মন্টগোমারি।

'মালপত্র এসে গেছে, কাজ আবার শুরু করার জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি,' বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল ধূসরচুলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর দু'চোখ।

'হুঁ,' আন্তরিকতার ছাপ নেই মন্টগোমারির কণ্ঠে, অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে।

'মিস্টার প্রেনডিককে আমাদের আস্তানায় নেয়া যাবে না,' এমনভাবে বলল ধূসরচুলো যেন আমি নেই ওর সামনে, 'দ্বীপের অন্য কোথাও তাঁর জন্য চালাঘর বানানোর সময়ও নেই। আবার তাঁকে বিশ্বাস করে সব কথা বলাও যাচ্ছে না এখনই।'

'আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম,' বলল মন্টগোমারি। 'তবে বাইরের দরজার সঙ্গে আমার যে ঘরটা আছে...'

'ঠিক,' সঙ্গে সঙ্গে বলল ধূসরচুলো, 'চলো তাহলে।'

বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম আমরা তিনজন।

'জানি আমার কথাবার্তা আপনার কাছে রহস্যজনক বলে মনে

হচ্ছে, মিস্টার প্রেনডিক,' বলল ধূসরচুলো। 'কিন্তু ঘটনাক্রমে এই দ্বীপে এসেছেন আপনি, আমরা কেউ বলিনি আসতে। আমাদের বাড়িটার ভিতরে গোপন কিছু ব্যাপার আছে। শুধু গোপন না, খুবই গোপন। তবে ভয়ঙ্কর কিছু না। যেহেতু আপনাকে চিনি না জানি না তাই...'

'স্বাভাবিক,' বললাম আমি। 'অচেনা লোকের কাছে গোপন কথা কেনই বা বলবেন?'

মুখ বাঁকিয়ে একটুখানি হাসল ধূসরচুলো—সদা-বিমর্ষ লোকটা বোধহয় এভাবেই হাসে। মাথা খানিকটা নত করে সৌজন্য প্রকাশ করল সে। বাড়ির ভিতরে ঢোকার সদর দরজা পার হয়ে এসেছি আমরা ইতোমধ্যে। কাঠের দরজাটা বিশাল, লোহার ফ্রেমে আটকানো, বেশিরভাগ সময় বোধহয় তালা মারা থাকে। লঞ্চের মালপত্র স্তূপ করে রাখা আছে বাইরে। দেয়ালের এককোনায় আরেকটা ছোট দরজা, আগে দেখিনি এটা।

পরনের তেলতেলে নীল জ্যাকেটের পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করল ধূসর চুলের লোকটা, ছোট দরজাটা খুলে ঢুকল ভিতরে। বোঝাই যাচ্ছে পুরো দ্বীপে সর্বময় কর্তৃত্ব ওরই, তারপরও নিরাপত্তার এত আয়োজন দেখে আশ্চর্য না-হয়ে পারলাম না। কিছু না-বলে ওর পিছু পিছু গিয়ে ঢুকলাম ছোট্ট একটা ঘরে।

সাদামাঠাভাবে সাজানো ঘরটা, কিন্তু দেখে মনে হয় আরামদায়ক। আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে ঘরের ভিতরে, কিছুটা খোলা দরজাটা; উঁকি দিয়ে দেখি পাথরে-বাঁধা একটা উঠান ওপাশে। দেরি না-করে দরজাটা বন্ধ করে দিল মন্টগোমারি। ঘরের এককোনায় ঝুলছে একটা দোলনা-বিছানা, লোহার শিক দিয়ে আটকানো কাচছাড়া ছোট্ট একটা সমুদ্রমুখী জানালাও আছে

ওই প্রান্তে।

'এখানেই থাকবেন আপনি,' বলল ধূসরচুলো। 'আর এই দরজাটা,' ভিতরের দিকের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'ওপাশ থেকে তালা মেরে রাখবো আমি যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। ওই দিকে দেখুন,' জানালার পাশে রাখা একটা ডেকচেয়ার আর একটা বুকশেলফ দেখাল সে। 'আশা করি সময় কাটাতে অসুবিধা হবে না আপনার।'

বইগুলো দেখলাম। বেশিরভাগই সার্জারির উপর, গ্রীক আর ল্যাটিন ক্ল্যাসিকও আছে কিছু। তবে সমস্যা হলো, ওই দুই ভাষার কোনোটাই জানি না আমি।

বাইরের দিকের দরজাটা দিয়ে বের হয়ে গেল ধূসরচুলো। সে চলে যাওয়ার পর মন্টগোমারি বলল, 'আমরা কখনও কখনও লাঞ্চ বা ডিনার করি এ-ঘরে।' চোখ সরু করে কয়েকটা মুহূর্ত কী যেন ভাবল সে, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে-ও। শুনলাম "ডক্টর মরো" বলে কাকে যেন ডাকছে।

ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না-দিয়ে এগিয়ে গেলাম বুকশেলফের দিকে। বই ঘাঁটছি, হঠাৎ মনে হলো, ওই মরো নামটা কোথায় যেন শুনেছি আগে। বসে পড়লাম জানালার পাশে। সঙ্গে কিছু বিস্কিট রয়ে গিয়েছিল, বের করলাম সেগুলো। বুভুক্ষুর মতো খেতে শুরু করলাম।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, মন্টগোমারির বাদামি চামড়ার সেই তিন অনুচরের একজন একটা প্যাকিংকেস টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে জানালার ফ্রেমের আড়ালে চলে গেল লোকটা। তারপর শুনি আমার পিছনের দরজাটায় চাবি ঢুকিয়ে তালা মারল কেউ।

সৈকত থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কুকুরগুলোকে। বদ্ধ দরজার

ওপাশে সশব্দে কী যেন শুঁকছে জন্তুগুলো, আর অদ্ভুত গলায় গর্‌গর্‌ করছে। ওদের দ্রুত হাঁটাচলার শব্দ ভেসে আসছে, একই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি ওগুলোকে শান্ত করার চেষ্টায় মন্টগোমারির ধমকানির আওয়াজ।

ওই দুই রহস্যময় লোকের গোপন সব কাজকর্ম ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। মরো নামটা কেন পরিচিত মনে হচ্ছে সে-ব্যাপারেও চিন্তা করলাম। কিন্তু মানুষের স্মরণশক্তি এমনই অদ্ভুত যে, সুপরিচিত সেই নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না তখন। বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার একপর্যায়ে খেয়াল হলো সৈকতের সেই বিকৃতদেহী লোকটার কথা। অমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাউকে চলতে-ফিরতে দেখিনি এর আগে। অস্বাভাবিক ওই লোকগুলোর কেউই কোনো কথা বলেনি আমার সঙ্গে, কিন্তু যতবার দেখা হয়েছে ততবার চোরাদৃষ্টিতে তাকিয়েছে আমার দিকে। দৃষ্টিটাও যেন কেমন, আদিবাসীদের মতো সহজ-সরল নয়। ভাব দেখলে মনে হয় ওরা স্বল্পভাষী, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আবার কথার তুবড়ি ছোটায় উদ্ভট এক ভাষায়। ভাবতে গিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল সব, জটিল এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলাম যেন। মন্টগোমারির সেই কদাকার চাকরের চোখদুটোর কথাও মনে পড়ল।

ভাবছি লোকটাকে নিয়ে, এমন সময় ঘরের ভিতরে ঢুকল সে। সাদা একটা পোশাক পরে আছে, একটা ট্রেতে করে কফি আর সিদ্ধ কিছু সব্জি নিয়ে এসেছে। ভীষণ চমকে উঠলাম ওকে দেখে, জানি না কেন সভয়ে পিছিয়ে গেলাম কিছুটা। কাছে এল সে, বিনীতভাবে ঝুঁকে আমার সামনের টেবিলের উপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল। ওর কালো, দড়ির মতো চুলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কানদুটো; দেখে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অচল হয়ে গেলাম আমি বিস্ময়ে। জন্তুদের মতো খাড়া, ছোট ছোট বাদামি

লোমে ভরা কান ওর!

'আপনার নাস্তা, সেআর,' বিকৃত উচ্চারণে বলল সে।

কিছুই বললাম না, বলতে পারলাম না আসলে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ওর চেহারার দিকে। ঘুরল লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে অদ্ভুতদৃষ্টিতে দেখল আমাকে, এবং আমার দিকে তাকিয়ে থেকেই রওয়ানা হলো দরজার উদ্দেশে। আমিও একদৃষ্টিতে দেখছি ওকে। আর ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল "মরো" নামটা।

দশ বছর আগের কথা। কোনো এক পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছিল একবার: "দা মরো হররস্!"

কথাটা উদ্দেশ্যহীনভাবে আমার মনে ঘুরপাক খেল কিছুক্ষণ, তারপর যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম হলুদাভ একটা প্যামফ্লেটের লাল একটা হেডলাইন—যে-খবর পড়ামাত্র শিউরে উঠবে যে-কেউ। মনে পড়ল ওই প্যামফ্লেট যখন চমকে দিয়েছিল লন্ডনবাসীদের তখন আমি নিতান্তই এক কিশোর, আর ডক্টর মরো বিশিষ্ট একজন ফিযিওলজিস্ট—অসাধারণ সব কল্পনা আর খোলাখুলি কথাবার্তার জন্য বিজ্ঞানমহলে সুপরিচিত।

এই দ্বীপের ধূসরচুলের লোকটা, যাকে "মরো" বলে ডাকছিল মন্টগোমারি, তিনি আর ওই পাগলাটে মরো কি একই লোক? রক্তসঞ্চালনের উপর তাকলাগানো কিছু লেখালেখি করেছিলেন বিজ্ঞানী মরো, শোনা গিয়েছিল অর্বুদ নিয়ে মূল্যবান গবেষণাও নাকি করছিলেন। তারপর হঠাৎ করেই সব বন্ধ হয়ে যায়। ইংল্যান্ড ছাড়তে হয় বেচারাকে। তাঁর গবেষণাগারে ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ নিয়েছিল এক সাংবাদিক, ইচ্ছা ছিল চাঞ্চল্যকর কোনো খবর যোগাড় করবে; মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনার (আদৌ যদি সেটা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে) খবর ছেপে দিয়ে নিজের মন্দাকাটতির প্যামফ্লেটকে রাতারাতি বিখ্যাত বানিয়ে দেয়

সে।

পত্রিকাটা যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিন মরোর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ছাল-ছাড়ানো, বা বলা ভালো মিউটিলেটেড একটা কুকুর। পত্রিকার সম্পাদক ছিল ওই ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্টেন্টের চাচাতো ভাই; বিন্দুবিসর্গও বাদ না-দিয়ে মরোর ব্যাপারটা ছাপে সে, এ-ধরনের গবেষণা বন্ধ করার জন্য আবেদন জানায় জনগণের বিবেকের কাছে। অন্যায়, দুর্নীতি বা পাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোক বা না-হোক, অন্তত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরুদ্ধে জনগণের বিবেক সদা-সজাগ—বলতে গেলে ঘাড় ধরে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় ডক্টর মরোকে। পত্রিকার খবর কতদূর সত্য জানি না, সত্য হলে স্বীকার করতেই হবে নীতিহীন নিষ্ঠুর এক গবেষণায় মেতে ছিলেন বিজ্ঞানী মরো; কিন্তু এখন দেখছি অন্য সব অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের মতো সামাজিকতা বিলিয়ে দিয়ে সেই গবেষণাকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। বিয়ে করেননি বলে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতেও কষ্ট হয়নি তাঁর।

মনে হচ্ছে, এই মরোই সেই মরো। সব ঘটনা এই একটা সম্ভাবনাকেই নির্দেশ করছে যেন। মালপত্রের সঙ্গে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুমা আর অন্য জন্তুগুলোকে, ওগুলোর কপালে কী আছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মোটেও।

ভাবনায় ডুবে ছিলাম বলে টের পাইনি এতক্ষণ, এবার নাকে লাগল ব্যবচ্ছেদ-কক্ষের অ্যান্টিসেপ্টিকের পরিচিত আর মৃদু গন্ধ। দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে পুমাটার গর্জন। আর্তনাদ করে উঠল একটা কুকুর, শুনে মনে হলো ওটাকে পিটিয়েছে কেউ।

মরোর "গোপন ব্যাপার" মানে যে আসলে জন্তু কাটাকাটি করা, বুঝতে পেরে জীববিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা

ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ আবার মনে পড়ল মন্টগোমারির সেই সূঁচলো কান আর জ্বলজ্বলে চোখের চাকরটার কথা। সবুজ ফেনিল সাগরটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম একদৃষ্টিতে, গত কয়েকদিনের অদ্ভুত ঘটনাগুলোর বিক্ষিপ্ত সব স্মৃতি ঘুরপাক খেতে লাগল মনের ভিতরে একে একে।

বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে গোপন আর সুরক্ষিত এক গবেষণাগার, প্রাণী-ব্যবচ্ছেদে ওস্তাদ কুখ্যাত কিন্তু দারুণ প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী, আর শারীরিকভাবে বিকৃত কিছু লোক—কী মানে এসবের?

আট

রহস্য আর সন্দেহের জট খুলছি, অদ্ভুত সেই চাকরকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল মন্টগোমারি দুপুর একটার দিকে। চাকরটার হাতে সকালের মতোই একটা ট্রে; সেটাতে কিছু রুটি, সব্জি, আরও কী সব যেন। এক ফ্লাস্ক হুইস্কি, এক জগ পানি, তিনটা গ্লাস আর ছুরিও আছে দেখলাম। আড়চোখে তাকালাম লোকটার দিকে, দেখি সে-ও আমাকে একদৃষ্টিতে দেখছে।

'লাঞ্চ করবো আপনার সঙ্গে,' বলল মন্টগোমারি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আবার বলল, 'জরুরি কিছু কাজে ব্যস্ত আছেন ডক্টর মরো, তাই আপাতত আসতে পারছেন না।'

তাকালাম ওর দিকে। 'নামটা শুনেছি আমি।'

'শুনেছেন!' নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের উপরই বিরক্ত হলো মন্টগোমারি, 'আমি একটা গাধা! কেন যে নামটা বলতে গেলাম! যাই হোক, মরোর নাম শুনে থাকলে আমরা এখানে কী করছি না-করছি বুঝে গেছেন বোধহয় এতক্ষণে !...হুইস্কি দেবো?'

'না, ধন্যবাদ। আমি মদ খাই না।'

'আমিও যদি না-খেয়ে থাকতে পারতাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'চোর পালানোর পর বুদ্ধি বাড়লে লাভ হয় না আসলে। যদি বলি এই মদই আমাকে এই দ্বীপে নিয়ে এসেছে বিশ্বাস করবেন? কুয়াশাচ্ছন্ন এক রাতে মরো আমাকে বললেন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছি কি না। আমি তখন মাতাল, ভাবলাম দারুণ এক সুযোগ পেয়েছি...'

ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিল চাকরটা, সঙ্গে সঙ্গে মন্টগোমারিকে বাধা দিয়ে বললাম, 'ওই লোকটার কানদুটো অমন খাড়া খাড়া কেন?'

ট্রে থেকে কিছু একটা নিয়ে মাত্র মুখে দিয়েছে মন্টগোমারি, চিবাতে শুরু করেনি এখনও, ওই অবস্থায়ই থেমে গেল সে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। 'খাড়া খাড়া কান?'

'হ্যাঁ, খাড়া খাড়া—জন্তুজানোয়ারের মতো।' যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললেও উত্তেজনায় দম যেন আটকে আসছে আমার, 'কিনারায় আবার বড় বড় লোমও আছে।'

অনেক সময় নিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল মন্টগোমারি, তাতে পানি মেশাল। তারপর বলল, 'ভুল দেখেছেন বোধহয়। ওর চুল লম্বা তো, কানদুটো ঢাকা থাকে সবসময়—চুলকেই লোম মনে হয়েছে আপনার।'

'সকালে আমার জন্য কফি পাঠালেন, নিয়ে এসে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে এই টেবিলে রাখার জন্য ঝুঁকল লোকটা। এত

কাছ থেকে ভুল দেখবো?' মাথা নাড়লাম। 'ওর কানদুটো লোমেভরা আর খাড়াই না শুধু, অন্ধকারে ওর চোখদুটোও জ্বলজ্বল করে—হুবহু জন্তুদের মতো।'

আমার প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়েছিল মন্টগোমারি, ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। 'আমারও তো একই কথা,' বুঝলাম যা বলছে সে বুঝে-শুনে চিন্তা করে বলছে, আর বলছে ওর সেই অদ্ভুত আধো আধো বোলে, 'ব্যাটা সবসময় চুল দিয়ে কান ঢেকে রাখে কেন? সমস্যাটা কী? ....ওর কানদুটো কীসের মতো যেন বললেন?'

বুঝলাম, বোকার ভান করছে সে। কিন্তু কথাটা বলতে পারলাম না ওকে। 'জন্তুদের মতো খাড়া খাড়া। কিছুটা ছোট আর লোমেভরা।...ওর মতো অদ্ভুত লোক আগে কখনও দেখিনি।'

তীক্ষ্ণ, কর্কশ একটা চিৎকারে চমকে উঠলাম এমন সময়—শুনে মনে হলো ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে পুমাটা। কেন যেন কুঁচকে গেল মন্টগোমারির চোখমুখ, তাড়াতাড়ি আমাকে বলল সে, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন?'

'লোকটাকে পেয়েছেন কোথায়?'

'সান ফ্র্যান্সিস্কো। মানছি সে কুৎসিত, দেখতে জানোয়ারের মতো, বুদ্ধিশুদ্ধিও কিছু কম আছে মাথায়, ওর বাড়ি কোথায় তা-ও জানি না। তবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি, এখন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। সে-ও মানিয়ে নিয়েছে।...ওকে বোধহয় খুব একটা ভালো লাগেনি আপনার?'

'লোকটা...কী বলবো...অস্বাভাবিক। ভাববেন না বাড়িয়ে বলছি—সে কাছে এলে গা ঘিনঘিন করতে থাকে আমার, হাত-পা শক্ত হয়ে আসে। শয়তানি মার্কা কিছু একটা আছে ওর মধ্যে।'

'অদ্ভুত!' খাওয়া থামিয়ে আমার কথা শুনছিল মন্টগোমারি,

খেতে শুরু করল আবার। 'তবে আমি কখনও শয়তানিমার্কা কোনো কিছু দেখিনি ওর মধ্যে। হয়তো আপনার মতো একই অনুভূতি হয়েছিল আইপেকাকুয়ানহার ক্রুদের, তাই সবাই একসঙ্গে খেপাত বেচারাকে। ক্যাপ্টেন কী করেছিল মনে আছে আপনার?'

আবার চেঁচিয়ে উঠল পুমাটা, আগেরবারের চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছে মনে হলো। বিড়বিড় করে কী যেন বলল মন্টগোমারি, শুনতে পেলাম না ঠিকমতো। সৈকতের বাদামি চামড়ার লোকগুলোর ব্যাপারে ওকে জিজ্ঞেস করবো কি না ভাবছি, সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ আর একটানা চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে দিল অসহায় পুমাটা।

'সৈকতের লোকগুলো,' শেষপর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'জাত কী ওদের?'

'জাত যা-ই হোক,' অন্যমনস্কভাবে বলল মন্টগোমারি, পুমার চিৎকার শুনে বারবার ভ্রূ কুঁচকাচ্ছে সে, 'চমৎকার মানুষ ওরা সবাই।'

আর কিছু বললাম না। বাড়তে বাড়তে এমন ভয়াবহ হয়েছে পুমার চেঁচানি যে, মনে হচ্ছে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে জন্তুটার। অনুজ্জ্বল ধূসর চোখে আমার দিকে তাকাল মন্টগোমারি, আরও কিছুটা হুইস্কি খেল। প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করল সে, মদের উপকারিতার ব্যাপারে ফালতু কিছু জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করল আমাকে। বলল, আইপেকাকুয়ানহায় আমাকে তুলে নেয়ার পর নাকি মদ খাইয়েই বাঁচিয়েছে আমাকে। ওর এত বড় উপকারিতার জন্য আমি যার-পর-নাই কৃতজ্ঞ শুনে বিচলিত হয়ে পড়ল, আর ওর এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখে আমিও আশ্চর্য হলাম কিছুটা।

খাওয়া শেষ করলাম আমরা, খাড়া কানঅলা কদাকার সেই

লোকটা এসে এঁটো থালাবাসন নিয়ে গেল। বিদায় নিয়ে চলে গেল মন্টগোমারিও। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না অসহায় পুমাটার উপর এতক্ষণ "অস্ত্রোপচার" চালাচ্ছিলেন মরো, ব্যথা সহ্য করতে না-পেরে চেঁচিয়ে দ্বীপ কাঁপিয়ে দিয়েছে জন্তুটা, সেই চিৎকার শুনে এমনকী মন্টগোমারিও বিরক্তি চেপে রাখতে পারেনি।

সময় যত গড়াতে লাগল তত তীব্র হতে লাগল পুমার চিৎকার, বিকেলের দিকে বিরক্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেলাম আমি। হোরাস নামের অতিপ্রাচীন এক রোমান কবির কবিতার অনুবাদ পড়ছিলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বইটা ঘরের এককোনায়। মুঠি পাকালাম, ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলাম, শেষে পায়চারি করতে লাগলাম পুরো ঘরে। কাজ হলো না কোনো কিছুতেই, অস্থিরতা তো কমলই না বরং বাড়ল, বাধ্য হয়ে আঙুল ঢুকিয়ে বন্ধ করলাম দু'কান।

লাভ হলো না তাতেও, একসময় মনে হতে লাগল চিৎকার করে আসলে যেন বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে পুমাটা। ওই বন্ধ ঘরে আর থাকতে পারলাম না আমি। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে, শেষবিকেলের তন্দ্রালু রোদে। এগিয়ে গেলাম সদর দরজার দিকে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি বন্ধ দরজাটা, তাই দেয়ালের কোনা ঘুরে সরে এলাম আরেক পাশে।

এখানে ঘরের চেয়েও জোরে শোনা যাচ্ছে শব্দটা। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে যত যন্ত্রণা আছে সব যেন ভর করেছে ওই চিৎকারে। চমৎকার রোদ আর সাগরের গা-জুড়ানো বাতাসে সবুজ হাতপাখার মতো গাছগুলোর দুলুনি সত্ত্বেও পুরো পরিবেশটা বিভ্রান্তিকর লাগছে, চলমান কতগুলো কালো আর লাল ছায়ামূর্তি যেন দুর্বোধ্য করে তুলেছে পুরো ব্যাপারটা। পিছু হটতে আরম্ভ

করলাম, বিচিত্র বর্ণের চৌখুপি নকশার দেয়াল টপকে লাফিয়ে পড়লাম বাইরে।

নয়

বাড়িটার পিছনের ঢালে জন্মানো ঝোপঝাড় ভেঙে লম্বা পদক্ষেপে এগোচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করছি না। খাড়া গুঁড়ির কতগুলো গাছের একটা জঙ্গল পার হয়ে ঢালের আরেকপ্রান্তে পায়ে-চলা একটা পথে উঠলাম। ক্রমশ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে পথটা, সরু একটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট একটা নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। থেমে কান পাতলাম। দূরত্বের জন্য হোক, অথবা ওই ঘন জঙ্গলের কারণে হোক, মরোর বাড়ির কোনো শব্দই শুনতে পাচ্ছি না আর। হঠাৎ পড়ে গেছে বাতাস, গাছের একটা পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না। খসখস শব্দ হলো আশপাশে কোথাও, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি গর্ত ছেড়ে বের হয়েছে একটা খরগোস। আমাকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাল ঢাল বেয়ে। কী করবো বুঝতে না-পেরে ইতস্তত করলাম কিছুক্ষণ, তারপর বসে পড়লাম ঢালের এককিনারায়।

জায়গাটা মনোরম। দু'তীরে প্রচুর গাছপালা জন্মে আড়াল করে ফেলেছে নদীটাকে। তবে একটা দিক ন্যাড়া, সেখানে ঝলমল করছে ত্রিভুজাকৃতির অল্প একটু পানি। পাতলা, নীলাভ

কুয়াশার চাদরে-ঢাকা গাছপালা আর লতাপাতার একটা জঙ্গল চোখে পড়ে আরও দূরে তাকালে। জঙ্গলটার মাথার উপর উজ্জ্বল নীল আকাশ, সেখানে সাদা আর লালের ছোপ ছোপ দাগ যেন পরগাছার মতো বেয়ে বেয়ে উঠছে যত্রতত্র। মুগ্ধচোখে কিছুক্ষণ দেখলাম প্রকৃতির এই রূপ, তারপর ভাবতে শুরু করলাম মন্টগোমারির অদ্ভুত সেই লোকগুলোকে নিয়ে। প্রচণ্ড গরমের কারণে চিন্তা করতে পারলাম না বেশিক্ষণ। কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব আচ্ছন্ন করল আমাকে, তন্দ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে চলে গেলাম।

কতক্ষণ পর জানি না, নদীর ওই তীর থেকে আসা মর্‌মর্‌ শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। ফার্ন আর নলখাগড়ার দুলুনি ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না প্রথমে। তারপর হঠাৎ দেখি কী যেন দেখা যাচ্ছে তীরে। প্রথম দেখায় বুঝতে পারলাম না জিনিসটা আসলে কী। গোলাকৃতির মাথা ঝুঁকিয়ে পানিতে মুখ ডুবাল সেটা, খেতে শুরু করল। এতক্ষণে বুঝলাম "জিনিসটা" আসলে একজন মানুষ, দেখতে হুবহু পশুর মতো। নীলচে কাপড় পরে আছে সে, গায়ের রঙ তামাটে, চুল কালো। ভাবলাম, দ্বীপবাসীদের সবাই বোধহয় অদ্ভুত আর কুৎসিত। মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে লোকটা; এত জোরে শব্দ করছে যে, দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

ওকে ভালোমতো দেখার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকলাম। আমার হাতে লেগে মাটি থেকে আলগা হয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল শুকনো একখণ্ড লাভা। ঝট করে মাথা তুলল লোকটা, অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, চোখাচোখি হলো আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সে, কদাকার দুই হাত দিয়ে মুখ মুছল। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, ওর পা-দুটো কেমন খাটো খাটো, শরীরের সঙ্গে

বেমানান। পুরো একটা মিনিট একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা, তারপর বার দুয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমার ডানদিকের কিছু ঝোপঝাড়ের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। লতাপাতার খসখস আওয়াজ শুনলাম কিছুক্ষণ, আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল শব্দটা। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। তন্দ্রালু ভাবটা উধাও হয়ে গেছে পুরোপুরি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম পিছন থেকে একটা শব্দ শুনে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি চওড়া সাদা লেজ দুলিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটে পালাচ্ছে একটা খরগোস। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পশুর মতো দেখতে ওই লোকটা আরও যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে বিকেলটাকে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম অকারণেই, এদিক-ওদিক তাকালাম, সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই বলে আফসোস হলো খুব। তখন মনে পড়ল নীলচে কাপড় পরে ছিল কদাকার লোকটা, অসভ্য আদিম নরখাদকদের মতো উলঙ্গ ছিল না মোটেও, তারমানে ধরে নেয়া যায় বুনো হলেও হিংস্র নয় সে।

ওকে দেখার পর থেকে যে-অস্বস্তিটা লাগছিল, সেটা গেল না তারপরও। ঢাল বরাবর সামনে, বামদিকে এগোলাম। বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি খাড়া গাছগুলোর আড়ালে কেউ আছে কি না। একটা লোক হাতের বদলে মুখ ব্যবহার করে জন্তুজানোয়ারের মতো পানি খায় কেন বুঝতে পারছি না। পাশব একটা চিৎকার শুনতে পেলাম এমন সময়, পুমাটার আর্তনাদ এখনও থামেনি মনে করে আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে তার ঠিক উল্টো দিকে পা বাড়ালাম। কিছুদূর হেঁটে হাজির হলাম নদীর কিনারায়, ঝোপঝাড় পার হয়ে এগিয়ে গেলাম আরও সামনে।

মাটির এখানে-সেখানে জন্মে আছে টকটকে লাল রঙের অদ্ভুত একজাতের ফাঙ্গাস; এত জীবন্ত যে, দেখে চমকে উঠলাম কিছুটা। পত্রাকার লাইকেনের মতো ঢেউখেলানো আর শাখাযুক্ত ফাঙ্গাসগুলো ছোঁয়া লাগলেই নুয়ে পড়ে। সামনে সুবিস্তৃত ফার্ন-জঙ্গলের শীতল ছায়া, সেটা পার হওয়ামাত্রই অপ্রীতিকর এক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মরে পড়ে আছে একটা খরগোস, ধড় থেকে সেটার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলেছে কেউ, অসংখ্য মাছি জেঁকে বসেছে লাশটার উপর, ছোপ ছোপ রক্ত চারদিকে। ভাবলাম, দ্বীপে বেড়াতে আসা অন্তত একজন অতিথির ভবলীলা সাঙ্গ হলো তাহলে! এদিক-ওদিক তাকালাম, কিন্তু আর কোনো হিংস্র ঘটনার নমুনা চোখে পড়ল না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় খরগোসটাকে হঠাৎ ধরে ফেলেই খুন করেছে কেউ, কিন্তু কে কেন কীভাবে কাজটা করল সেটাই চিন্তার বিষয়। নরপশু সেই লোকটাকে নদীতীরে দেখার পর যে-ভয়টা জেগেছিল মনে সেটাই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাকে। অজানা অচেনা কতগুলো লোকের সঙ্গে নিরস্ত্র আর একাকী অবস্থায় চলাফেরা করে কত বড় ভুল করেছি বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। চারপাশের ঘন জঙ্গলটা যেন পাল্টে গেল মুহূর্তের মধ্যে, জীবন্ত হয়ে উঠল যেন প্রতিটা ছায়া। মনে হচ্ছে ওত পেতে কেউ-না-কেউ অপেক্ষা করছে আমার জন্য কোনো-না-কোনো জায়গায়। পাতা বা ঘাসের সামান্য খসখস শব্দেই চমকে চমকে উঠছি। শিকার ধরার আশায় উন্মুখ হয়ে লোলুপদৃষ্টিতে আমাকে দেখতে থাকা অদৃশ্য কতগুলো চোখ দেখতে পেলাম কল্পনায়, চেষ্টা করেও ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না মাথা থেকে। সৈকতে, আমার সেই নিরাপদ ঘরে ফিরে যাওয়ার প্রচণ্ড একটা তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম। তারপর জানি না কখন ঘুরে দাঁড়ালাম

হঠাৎ, ঝোপঝাড় ভেঙে উন্মত্তের মতো ছুট লাগালাম, জঙ্গল পার হয়ে ফাঁকা কোনো জায়গায় যেতে চাচ্ছি যত-দ্রুত-সম্ভব।

জলপ্রপাতের কারণে সৃষ্ট খোলা একটা জায়গায় এসে থামলাম। চারপাশ চারাগাছে ভরা—তারমানে আর বেশিদিন খালি থাকবে না জায়গাটা। জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠা গাছ আর থোকা থোকা ফাঙ্গাসের ঘন জঙ্গলটা এখন আমার পিছনে। কিছুটা সামনে মাটিতে পড়ে আছে ছত্রাকে-ধরা বড় একটা গাছ, সেটার উপর যেন আসন পেতে বসে আছে অদ্ভুত আকৃতির তিনজন মানুষ—আমাকে দেখেনি এখনও। তিনজনের একজন মেয়েলোক, দু'জন পুরুষ। কোমরে লাল একফালি কাপড় ছাড়া পোশাক বলতে কিছু নেই ওদের শরীরে, অনুজ্জ্বল মেটে গোলাপি রঙের ত্বক অনাবৃত। এ-পর্যন্ত যে-ক'জন দ্বীপবাসী দেখলাম, এদের গায়ের রঙ সবার চেয়ে আলাদা। গোলগাল ভারী চেহারায় থুতনি নেই, ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে চ্যাপ্টা কপাল, খোঁচা খোঁচা অল্প কয়েকগাছি চুল মাথায়।

কী নিয়ে যেন কথা বলছে ওরা, বলা ভালো দুই পুরুষের একজন বলছে আর বাকিরা শুনছে; একটু পর পর মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর কাঁধ দোলাচ্ছে তিনজনই। আলোচনায় এতই মগ্ন ওরা যে, আমার এগোনোর শব্দ শুনতে পেল না। আমিও ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি না ঠিকমতো, যতটুকু শুনছি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হলো দুর্বোধ্য কোনো মন্ত্র পড়ছে যেন লোকটা। ক্রমেই তীক্ষ্ণ থেকে আরও তীক্ষ্ণ হচ্ছে ওর কণ্ঠ, একটু পর দু'হাত দু'পাশে বিস্তৃত করে উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সমস্বরে গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়াল বাকি দু'জনও, দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করেছে এরাও, গান বা প্রার্থনাসঙ্গীত যেটাই হোক না কেন ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে শরীর দোলাচ্ছে। ওদের

পায়ের দিকে তাকালাম, যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই-তিনজনের পা-ই অস্বাভাবিক খাটো; পায়ের পাতা লম্বা, সরু, কদাকার।

চক্রাকারে ঘুরছে ওরা তিনজন, হাত নাড়তে নাড়তে পা ঠুকছে মাটিতে। ভাষা অবোধ্য হলেও ওদের উচ্চারণে স্পষ্ট একটা সুর আছে, "আলুলা" আর "বালুলা" জাতীয় দুটো শব্দ শুনলাম বেশ কয়েকবার। অদ্ভুত এক আনন্দে জ্বলজ্বল করছে ওদের চোখ, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা। ঠোঁটহীন মুখ থেকে গড়াচ্ছে লালা।

ওদের অদ্ভুত কাজকর্ম দেখতে দেখতে জানি না কেন বিস্ময় আর দ্বিধার অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলাম, যা দেখছি সেটা সত্যি কি না সন্দেহ হতে লাগল। সামনের...কী বলবো...প্রাণীগুলো দেখতে মানুষের মতো ঠিকই, কিন্তু আচার-আচরণে হুবহু পশুর মতো; মানুষের আকার, কোমরের ওই একটুকরো কাপড়, আর ছিটেফোঁটা মনুষ্যত্ব বাদ দিলে ওই তিনজনেরই চালচলনে, মুখের ভাবে, সমগ্র অস্তিত্বে পাশবিকতার প্রকট বহিঃপ্রকাশ—শুয়োরের মতো একেবারে।

হতভম্ব হয়ে ভাবছি এসব কথা, হঠাৎ শূন্যে লাফাতে শুরু করল ওই তিনজন; লাফাচ্ছে আর উঁচু গলায় চেঁচাচ্ছে, একটু পর পর ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করছে মুখ দিয়ে। পিছলে গেল একজন, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গে। আরেকবার থমকাতে হলো আমাকে—যেন মানুষ থেকে জন্তুতে পরিণত হতে দেখেছি কাউকে এইমাত্র। পাশবিকতার এই প্রকাশ যত স্বল্পস্থায়ীই হোক না কেন আর সহ্য করতে পারলাম না আমি।

যতটা নিঃশব্দে সম্ভব ঘুরলাম, আস্তে আস্তে সরে এলাম ওই জায়গা থেকে, গিয়ে ঢুকলাম জঙ্গলে। পায়ের চাপে কোনো ডাল ভাঙলে বা পাতা খসখস করলেই ভয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে আসছে

আমার–এই বুঝি ওরা দেখে ফেলল আমাকে! অনেকক্ষণ পর সাহস ফিরে পেলাম কিছুটা, মনে হলো স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করা যায় এখন। জঘন্য ওই লোকগুলোর থেকে যত দূরে সম্ভব চলে যেতে চাইছি। বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনায় এতই মশগুল ছিলাম যে, খেয়ালই করিনি কখন যেন হাঁটতে শুরু করেছি অস্পষ্ট একটা পায়ে-চলা পথ ধরে।

ফাঁকা একটা জায়গা অতিক্রম করার সময় হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, কতগুলো গাছের পিছনে দেখা যাচ্ছে কদাকার একজোড়া পা; আমি যেদিকে যাচ্ছি ঠিক সেদিকেই যাচ্ছে পায়ের মালিক, তবে ত্রিশগজের মতো একটা দূরত্ব বজায় রাখছে সবসময়। ওর মাথা আর শরীরের উপরের অংশ এখনও লতাপাতার জটের আড়ালে। জন্তুটা আমাকে দেখতে পায়নি ভেবে থেমে দাঁড়ালাম তৎক্ষণাৎ। হাঁটা থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল পা-দুটোও।

ভয়ের একটা স্রোত আমার মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল উপরে। মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য নিজের উপর জোর খাটাতে হলো আমাকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা জন্তুটাকে, হয়তো বলা ভালো মানুষটাকে চিনতে পারলাম বোধহয়–এই লোকই নদীতে মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছিল। ঘাড় ঘুরাল সে এবার, পান্নার মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর চোখদুটো সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে, আমাকে একনজর দেখে অন্যদিকে তাকানোর কারণে জ্বলে উঠেই নিভে গেল সেই দ্যুতি। একটা মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর নিঃশব্দে কয়েক পা হেঁটে দৌড়াতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর হারিয়ে গেল কতগুলো ঝোপের আড়ালে। আর দেখতে পেলাম না ওকে, তবে টের পেলাম দূরে কোথাও থেমে দাঁড়িয়ে আবার আমাকে দেখছে সে।

লোকটা কী আসলে–মানুষ না পশু? আমার কাছে কী চায়?

অস্ত্র তো দূরের কথা, একটা লাঠিও নেই আমার হাতে। ছুটে পালাতে চাইছে আমার পা-দুটো, কিন্তু ওদেরকে অনেক কষ্টে শাসনে রেখেছে কৌতূহলী মন। মানুষ বা জন্তু যা-ই হোক, জ্বলজ্বলে চোখ আর কদাকার পা-এর ওই জিনিসটার সাহসের অভাব আছে; নইলে অনেক আগেই লাফিয়ে পড়তে পারত আমার ঘাড়ে, টেরও পেতাম না আমি। সে যেদিকে গেছে সেদিকে পা বাড়ালাম দাঁতে দাঁত চেপে। মনে হচ্ছে ভয়ে জমে যাবে মেরুদণ্ড, কিন্তু ভাবটা গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। সাদা ফুলের লম্বা কতগুলো ঝোপ পার হয়ে দেখতে পেলাম ওকে—ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, ইতস্তত করছে।

ওর চোখে চোখ রেখে দু'-এক পা আগে বাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার চোখ তুলে আমাকে একবার দেখল কি দেখল না লোকটা। হঠাৎ 'না!' বলেই ঘুরল, ঝোপঝাড় ভেঙে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল কিছুটা দূরে। তারপর থামল, ঘুরে আবার তাকাল আমার দিকে। গোধূলির আলোয় গাছের ছায়ায় আবার যেন জ্বলে উঠল ওর চোখদুটো।

স্বাভাবিক থাকার যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার বুকের খাঁচায় অবিরাম বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু বুঝতে পারছি জানতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে আমাকে, তাই ধীরপায়ে এগোচ্ছি লোকটার দিকে। কিন্তু ধরা দেয়ার কোনো ইচ্ছা নেই ওর—হঠাৎ ঘুরে একছুটে উধাও হয়ে গেল সে। ওর চোখের সেই ঝলকানি আরেকবার দেখলাম।

পুবাকাশে নিভে যাচ্ছে গোধূলির আলো। আস্তে আস্তে জমাট বাঁধছে সন্ধ্যার অন্ধকার, আরও যেন বাড়ছে জঙ্গলের ঘনত্ব। আমার মাথা ঘিরে নিঃশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা মথ। এতক্ষণে

বুঝলাম দেরি হয়ে গেছে অনেক, রাতটা বনে কাটানো উচিত হবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরা দরকার সৈকতের ধারে আমার সেই ঘরে। কিন্তু বিভীষিকার ওই আস্তানায় যেতে ইচ্ছাও করছে না, আবার অজানা অচেনা এই জঙ্গলে গাঢ় অন্ধকারে আধা-জন্তু আধা-মানুষ জাতীয় কোনো প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ারও সাধ নেই। অদ্ভুত সেই লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকালাম আরেকবার। জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। ঢালটা কোনদিকে আছে অনুমান করে নিয়ে পা বাড়ালাম, নদীর তীরে পৌঁছাতে পারলে বাকি পথটুকু চিনে নিতে পারবো।

জানি না কেন অস্থির লাগছে হঠাৎ করেই, দ্রুত হাঁটছি। এলোমেলো ভাবনায় বিভ্রান্ত হয়ে আছে মন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালার মধ্যে সমতল একটা জায়গায় হাজির হলাম অনেকটা নিজেরই অজান্তে। সূর্যাস্তের লালিমা মুছে গিয়ে বর্ণহীন আর স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল আকাশটা, এখন কালো থেকে আরও কালো হচ্ছে সেটা প্রতি মুহূর্তে, একের পর এক তারা ফুটছে। এক গাছ থেকে আরেক গাছের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিনের আলোয় ছিল অস্পষ্ট, আর এখন ঘন কালো ও রহস্যময়। এগিয়ে চললাম আমি। মনে হচ্ছে চারপাশের জগৎ থেকে সব রঙ মুছে গিয়ে শুধু কালো রঙটাই রয়ে গেছে, অনুজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে জীবন্ত একেকটা ছায়ামূর্তি যেন আশপাশের গাছগুলো। যত এগোচ্ছি তত কমছে গাছের সংখ্যা, বাড়ছে ঝোপঝাড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলাম সাদাবালির হতশ্রী এক জায়গায়, তারপর ঝোপঝাড়ে ভরা বিস্তৃত এক প্রান্তরে। বিকেলে এখানে এসেছিলাম কি না মনে করতে পারলাম না।

ডানদিক থেকে আসা মৃদু একটা খসখস শব্দ সেই তখন থেকে পিছু নিয়েছে আমার, কিন্তু ভুল শুনছি ভেবে পাত্তা দেইনি

এতক্ষণ–কারণ যতবার থেমে দাঁড়িয়েছি ততবার থেমে গেছে শব্দটা, রাতের বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। কিন্তু আবার যখন পা বাড়ালাম, স্পষ্ট শুনতে পেলাম আরেকজোড়া পায়ের আওয়াজ–যেন আমারই পদশব্দের প্রতিধ্বনি হচ্ছে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে!

ঝোপ যেখানে বেশি ঘন, সরে এলাম সে-জায়গা থেকে। তুলনামূলক ফাঁকা একটা জায়গা দিয়ে হাঁটছি এখন, আমার দিকে চুপিসারে কিছু আসছে কি না দেখার জন্য হঠাৎ হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু তারপরও বার বার মনে হচ্ছে কিছু একটা বা কেউ একজন আছে আশপাশে। হাঁটার গতি বাড়ালাম, কিছুক্ষণ পর ছোট্ট একটা ঢাল পার হয়ে কিছুদূর এগিয়েই ঘুরলাম, দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ঢালটার দিকে।

কালো আকাশের পটভূমিতে আরও কালো একটা আকৃতিহীন মূর্তির মতো ঢাল বেয়ে একটু একটু করে উঠে এল জিনিসটা, এবং উধাও হয়ে গেল আবার। দুটো বিষয়ে নিশ্চিত হলাম একইসঙ্গে–তামাটে চেহারার সেই আধা-জন্তু আধা-মানুষটা আবারও পিছু নিয়েছে আমার এবং পথ হারিয়েছি আমি।

হতাশ হয়ে পড়লাম, কী করবো ভেবে পাচ্ছি না। লাভ হবে না বুঝেও পা টিপে টিপে ধীরগতিতে হাঁটছি। জানি আমার পিছু পিছু আসছে লোকটা। ওকে দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে, কিন্তু আমাকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে সে। মানুষ বা পশু যা-ই হোক না কেন, অজ্ঞাত কোনো কারণে আমাকে আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে না সে, অথবা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছে হয়তো। এগোচ্ছি আমি, যতটা পারা যায় খোলা জায়গায় থাকছি, ঝোপঝাড়ের ধারেকাছেও যাচ্ছি না। একটু পর পর থামছি, কান

পাতছি ওর পায়ের ক্ষীণ আওয়াজ শোনার আশায়। বার কয়েক চেষ্টার পরও তেমন কিছু শুনতে না-পেয়ে ভাবলাম, আমাকে অনুসরণ করা বাদ দিয়ে চলে গেছে বোধহয়। অথবা পুরো ব্যাপারটাই হয়তো আমার উত্তেজিত মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা। সাগরের ঢেউ-এর শব্দ শুনতে পেলাম তখন। চলার গতি বাড়িয়ে বলতে গেলে দৌড়াতে শুরু করলাম, ঠিক তখনই একটা আওয়াজ শুনে মনে হলো যেন হোঁচট খেয়েছে কেউ আমার পিছনে।

সঙ্গে সঙ্গে থামলাম, ঘুরে তাকালাম পিছনের অন্ধকার গাছগুলোর দিকে। মনে হলো কালো একটা ছায়া যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। হাত-পা শক্ত হয়ে এল; কান খাড়া করলাম আরেকবার, কিন্তু শুনলাম কেবল আমারই হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ। টানটান হয়ে উঠেছে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু, সবই আসলে আমার অতিকল্পনা ভেবে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আবার।

মিনিটখানেকের মধ্যে কমে এল গাছপালার সংখ্যা। সাগরের তীরবর্তী নিচু আর নগ্ন একটা অন্তরীপে হাজির হলাম আরও কিছুক্ষণ পর। রাতের পরিষ্কার আকাশে ক্রমেই বাড়ছে তারার সংখ্যা, শান্ত সাগরের অনুচ্চ ঢেউ-এ প্রতিফলিত হয়ে কাঁপছে ম্লান সেই আলো। দূরে, তীরের সারি সারি পাথরের উপর আছড়ে পড়ে ফ্যাকাসে আভায় দ্যুতিময় হয়ে উঠছে ফেনিল স্রোত। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারার হলুদ প্রভা। পুবে বিস্তৃত হতে হতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে সৈকত, পশ্চিমেও কিছুটা ঢাকা পড়েছে অন্তরীপের কারণে। মনে পড়ল, ডক্টর মরোর বাড়িটা সৈকতের পশ্চিমদিকে।

মট্ করে একটা ডাল ভাঙল আমার পিছনে, খসখস শব্দ শুনতে পেলাম স্পষ্ট। পাঁই করে ঘুরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকলাম অন্ধকার গাছগুলোর দিকে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; অস্পষ্ট আলোয় কালো যে-কোনো অবয়বকেই মনে হচ্ছে অলক্ষুণে, মনে হচ্ছে অশুভ কোনো শক্তির কারসাজিতে প্রাণ পেয়ে সব যেন আমাকেই দেখছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। পুরো একটা মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর গাছগুলোর উপর থেকে চোখ না-সরিয়ে অন্তরীপটা পার হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরলাম পশ্চিমদিকে। ঠিক তখনই ওত-পেতে-থাকা হাজারটা ছায়ায় মধ্যে একটা ছায়া নড়ে উঠে পিছু নিল আমার।

হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেল আবার। বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছি, সৈকতের পশ্চিমদিকের অনেকখানি দেখতে পাচ্ছি এখন। থামলাম, নিঃশব্দ সেই ছায়াটাও আমার থেকে প্রায় বারো গজ দূরে থেমে দাঁড়াল।

অন্তরীপের শেষ মাথায়, বাঁকের ধারে দেখতে পাচ্ছি আলোর ছোট্ট একটা বিন্দু; তারার আলোয় অস্পষ্ট হয়ে আছে বালুময়, ধূসর, বিস্তৃত বেলা। আলোটা কতদূরে হতে পারে অনুমান করলাম—দু'মাইল সম্ভবত। সৈকতে যেতে হলে ঝোপঝাড়ে ভরা ঢাল আর সারি সারি গাছের নাতিদীর্ঘ একটা জঙ্গল পার হতে হবে আমাকে। কিন্তু সমস্যা হলো, আলকাতরার চেয়েও কালো অন্ধকারে ডুবে আছে ওদিকটা, ওখানে যেতে মন সায় দিচ্ছে না কিছুতেই।

এখন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি "জিনিসটাকে"। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সুতরাং আর যা-ই হোক জন্তুজানোয়ার নয় সেটা। কথা বলার জন্য মুখ খুললাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। মনে হলো গলার কাছে আটকে আছে কিছু একটা। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম বাধ্য হয়েই, 'কে?'

জবাব নেই। এক কদম আগে বাড়লাম। জায়গা ছেড়ে সরল

না জিনিসটা, একটু নড়েচড়ে উঠল কেবল। আরেক কদম সামনে এগোলাম। পায়ের ধাক্কা লেগে সামান্য দূরে সরে গেল ছোট একটা পাথর। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো অবয়বটার উপর থেকে চোখ না-সরিয়ে ঝুঁকে তুলে নিলাম পাথরটা। আমাকে নিচু হতে দেখে কুকুরের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরল জিনিসটা, একছুটে মিলিয়ে গেল দূরের অন্ধকারে।

রাস্তার বাঘা কুকুরদের কবল থেকে বাঁচার জন্য খারাপ কিন্তু কার্যকরী এক উপায় বের করেছিল এক স্কুলছাত্র–ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। পাথরটা আমার রুমালে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়ে রুমালটা ভালোমতো জড়ালাম হাতে, তারপর বাতাসে কয়েকবার ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলাম কেমন কাজ করছে আমার "পাথর-অস্ত্র"।

দূরের অন্ধকার থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে এল, জিনিসটা আবার ফিরে আসছে মনে হয়। টান টান এই উত্তেজনা সহ্য করতে পারলাম না আর, ঘেমে নেয়ে উঠলাম, কাঁপতে লাগলাম জ্বোরো রোগীর মতো। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলাম, হাতে সেই পাথর-অস্ত্র। না-দেখেও জানি মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে পিছন পিছন ধেয়ে আসছে কালো অবয়বটা।

একদৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লাম সাগরতীরের লম্বা গাছ আর ঘন ঝোপঝাড়ের সেই জঙ্গলে। অন্তরীপ ছাড়িয়ে সৈকতের দিকে ছুটছি এখন। ছোট জঙ্গলটা পার হয়ে বেলার বালিতে পা রেখেছি মাত্র, পিছনে শুনি ঝোপঝাড় ভেঙে দুদ্দাড় করে ছুটে আসছে কেউ। ভয়ে মাথা প্রায়-খারাপ হয়ে গেল আমার। পড়িমরি করে ছুটলাম আবার।

পিছু ধাওয়া করে আসছে, আরও কাছে এসে পড়েছে নরম একজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। বীভৎস একটা আর্তনাদ

বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে, ছোটার গতি বাড়িয়ে দিলাম আরও। আমাকে ছুটতে দেখে লাফিয়ে গিয়ে ঝোপের ভিতরে ঢুকল কালো আর অস্পষ্ট, খরগোসের চেয়ে তিন কি চারগুণ বড় কতগুলো ছায়া। ওগুলো কী সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না, ঘামানোর মতো অবস্থাও নেই।

যতদিন বাঁচবো, এই ছুটে পালানোর কথা মনে থাকবে আমার। পানির কিনারা দিয়ে ছুটছি, পিছন থেকে শুনতে পাচ্ছি ছলাৎ ছলাৎ শব্দ—প্রতিমুহূর্তে আরও কাছে আসছে। হলুদ সেই আলোটা মনে হচ্ছে কয়েক যোজন দূরে। চারদিক নিস্তব্ধ। ছলাৎ, ছলাৎ—তাড়া করে আসছে ওটা; আরও কাছে এল, আরও। অভ্যাস নেই—দম ফুরিয়ে আসছে আমার। একেবারে কাছে এসে পড়েছে জিনিসটা, ওটার হাঁপানোর শব্দও শুনতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি মরোর বাড়িতে পৌঁছানোর অনেক আগেই আমাকে ধরে ফেলবে সেটা। ছুরি খাওয়ার মতো তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করলাম কেন যেন। হাঁ করে দম নিতে নিতে মরিয়া হয়ে ঘুরলাম জন্তুটার দিকে। এতক্ষণ চারপায়ে পিছু ধাওয়া করছিল, এবার দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, আমার দিকে হাত বাড়াল—টুঁটি চেপে ধরতে চায় বোধহয়।

রুমালধরা হাতটা সর্বশক্তিতে ঝাড়া দিলাম আমি, গুলতির ঢেলার মতো তীব্র গতিতে বের হয়ে জন্তুটার কপালের বামদিকে প্রচণ্ড জোরে গিয়ে লাগল পাথরটা। বাড়ানো হাতদুটো থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে, টলতে টলতে আমাকে ছাড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ল সে বালিতে, মুখটা গিয়ে পড়ল সাগরের পানিতে। পড়ে থাকল ওভাবেই, নড়ল না আর।

ওর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হলো না। ছোট ছোট ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে ওর গায়ে, আর বিস্তৃত বেলায় স্থির হাজারটা

তারার নীচে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ওকে ওভাবেই ফেলে রেখে মরোর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কিছুদূর এগোনোর পর কানে এল পুমাটার করুণ কণ্ঠ—এখনও কাতরাচ্ছে বেচারা। কিন্তু এবার বিরক্তি নয় বরং অদ্ভুত এক স্বস্তি পেলাম গোঙানিটা শুনে। এই আওয়াজটাই সহ্য করতে না-পেরে মরোর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম, রহস্যময় এই দ্বীপে ঘুরে ভয়াবহ কিছু অভিজ্ঞতা হওয়ার পর ফিরে যাচ্ছি আবার সেখানেই। খুবই কাহিল লাগছে, ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি সৈকতেই। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্রিত করে ছুটে চললাম সেই আলোটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে মনে হলো, আমার নাম ধরে ডাকছে কেউ।

দশ

আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে আলো আসছে; অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আয়তাকার সেই আলোর প্রান্তে পা রেখেছি, এমন সময় শুনলাম চেঁচিয়ে ডাকছে মন্টগোমারি, 'প্রেনডিক!'

এগিয়ে চললাম। আবারও ডাকল আমাকে মন্টগোমারি, ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিলাম, 'হ্যালো!' কয়েক মুহূর্ত পর টলমল করতে করতে হাজির হলাম ওর সামনে।

'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?' আমার হাত ধরল সে, এমনভাবে দাঁড়াল যাতে দরজা দিয়ে আসা আলোটা পড়ে আমার মুখের

উপর। 'আমি আর ডক্টর মরো কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, মাত্র আধঘণ্টা আগে মনে হয়েছে আপনার কথা।' আমাকে ধরে ঘরে নিয়ে গেল সে, ডেকচেয়ারে বসিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। 'ভাবতেও পারিনি আমাদেরকে না-বলে এরকম একা একা ঘুরতে বের হয়ে যাবেন,' বলে চলল সে। 'ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম...কিন্তু...এ কী!'

আমার শরীরের সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে ততক্ষণে, মাথাটা আপনাথেকেই ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি আমাকে ব্র্যান্ডি এনে দিল মন্টগোমারি; জীবনে যে-লোক মদ ছুঁয়েও দেখেনি, তাকে মদ খাইয়ে কিছুটা সুস্থ করে তুলে দারুণ মজা পেল সে বোধহয়।

'ঈশ্বরের দোহাই,' বললাম কোনোরকমে, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

'আজব কিছু দেখেছেন মনে হয়?' বলতে বলতে দরজা বন্ধ করে দিল সে, তারপর এসে দাঁড়াল আমার সামনে। কিন্তু একটা প্রশ্নও জিজ্ঞেস করল না আর, পানি মিশিয়ে আরও কিছুটা ব্র্যান্ডি দিল আমাকে, খাওয়ার জন্য চাপাচাপি করতে লাগল। অবসাদে আমার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, কাজেই কথা বাড়ালাম না। আমাকে সতর্ক করতে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে কী সব যেন বলল সে, তারপর জানতে চাইল কখন বাইরে গিয়েছি, কী কী দেখেছি।

সংক্ষেপে, টুকরো টুকরো কথায় উত্তর দিলাম। শেষে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসবের মানে কী বলুন আমাকে।'

'ভয়ঙ্কর কিছু না,' বুঝলাম কথা ঘুরানোর চেষ্টা করছে সে, 'আজ আর শুনে লাভ নেই, এমনিতেই অনেক ধকল গেছে আপনার উপর দিয়ে।'

'আমাকে ধাওয়া করেছিল যে-জিনিসটা সেটা আসলে কী?

পশু না মানুষ?'

চেঁচিয়ে উঠল পুমাটা, বিড়বিড় করে কী যেন বলল মন্টগোমারি। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এখন না-ঘুমালে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আপনার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'জিনিসটা কী?'

আমার চোখে চোখ রেখে মুখ বাঁকাল সে। একটু আগেও প্রাণচঞ্চল ছিল ওর চোখদুটো, নিষ্প্রভ হয়ে গেল হঠাৎ করেই। বলল, 'আপনার বর্ণনা শুনে তো মনে হয় ভূত।'

প্রচণ্ড বিরক্তি জাগল মনে, কিছু সময় পরে সেটা চলেও গেল আবার। ধপাস করে বসে পড়লাম চেয়ারটাতে, হাত দিয়ে চেপে ধরলাম কপাল। আরও একবার চেঁচিয়ে উঠল পুমাটা।

আমার পিছনে এসে দাঁড়াল মন্টগোমারি, হাত রাখল আমার কাঁধে। 'আমাদের এই...হতচ্ছাড়া দ্বীপে যখন যেখানে খুশি যাবেন আপনি—বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই আমার। কিন্তু যতটা খারাপ মনে করছেন, দ্বীপটা ততটা খারাপ না। আসলে খুবই উত্তেজিত হয়ে আছেন আপনি। টানা কয়েক ঘণ্টার ঘুম দরকার আপনার। একটা ওষুধ দেই আপনাকে, তারপর ঘুম থেকে উঠলে না-হয় আবার কথা বলা যাবে ব্যাপারটা নিয়ে।'

কিছু বললাম না। সামনে ঝুঁকে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম। বাইরে গেল মন্টগোমারি, কিছুক্ষণ পর গাঢ় রঙের একজাতের তরল পদার্থে পূর্ণ একটা মেজার হাতে নিয়ে ফিরে এল। আমাকে জিনিসটা দিল সে। সুবোধ বালকের মতো খেয়ে নিলাম ওষুধটুকু। আমাকে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল সে।

ঘুম থেকে জেগে দেখি, সকাল হয়ে গেছে অনেক আগেই। চিত হয়ে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ছাদের দিকে। খেয়াল করলাম, বরগাগুলো কোনো জাহাজের কাঠ

দিয়ে বানানো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি টেবিলের উপর কিছু খাবার রাখা আছে। খিদা টের পেলাম এতক্ষণে, নামতে গেলাম দোলনা-বিছানা থেকে। অভ্যাস নেই, তাই একদিকে কাত হয়ে গেল বিছানাটা, হুড়মুড় করে উল্টে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে বসলাম খাবারের সামনে। মাথাটা ভার হয়ে আছে, গত রাতে যা যা ঘটেছে মনে করতে পারছি না ঠিকমতো। কাচছাড়া জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে সকালের মৃদুমন্দ মনোরম বাতাস। ঘরের ভিতরের দিকের দরজাটা, মানে যে-দরজা দিয়ে বাড়ির উঠানে যাওয়া যায়, খোলা। ঘুরে সেদিকে তাকিয়ে দেখি মন্টগোমারি দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে তাকাতে দেখে বলল, 'আমি খুব ব্যস্ত এখন, পরে কথা হবে।' দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সে।

খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, দরজা বন্ধ করেছে ঠিকই, কিন্তু তালা মারতে ভুলে গেছে মন্টগোমারি। দ্বীপে আমি একা ঘুরে বেড়িয়েছি শোনার পর ওর চেহারাটা কেমন হয়েছিল মনে পড়ল তখন, গতরাতের সবগুলো ঘটনা একে একে যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম, আর যা-ই হোক পুমাটা চেঁচায়নি এবার। খাওয়া থামিয়ে কান পেতে রইলাম। কিন্তু বাতাসের ফিসফিসানি ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। ভুল শুনেছি ভেবে খেতে আরম্ভ করলাম আবার, তবে কান খাড়া আছে এখনও।

অনেকক্ষণ পর নিচু আর ক্ষীণ আরেকটা আওয়াজ শুনলাম। বসে থাকলাম স্থাণুর মতো, ভয়ে জমে গেছি প্রায়। বিভীষিকার এই বাড়িতে এ-পর্যন্ত যত শব্দ শুনেছি, মৃদু হলেও ওই শব্দটাকেই কেন যেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মনে হলো। অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা একটা আওয়াজ—গোঙানির মতো। মনে হয় ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ, অথবা

হয়তো নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে দম আটকে আসছে বেচারার। বুঝতে অসুবিধা হলো না, জন্তুজানোয়ার না, কোনো মানুষ কাতরাচ্ছে এবার।

আর দেরি করলাম না, চেয়ার ছেড়ে উঠে তিন লাফে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজাটার সামনে, হাতল ঘুরিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে হাজির হলাম উঠানে। পিছনে খোলাই থাকল দরজাটা।

'প্রেনডিক! থামুন!' চেঁচিয়ে বলল মন্টগোমারি, জানি না কোত্থেকে হঠাৎ হাজির হয়ে আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে সে।

চমকে উঠেছে একটা ডিয়ারহাউন্ড, দাঁত বের করে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। সামনে একটা সিঙ্ক, তাতে ছোপ ছোপ রক্ত–শুকিয়ে বাদামি হয়ে গেছে কিছু, আবার কিছু একেবারে টাটকা। কার্বোলিক অ্যাসিডের কড়া গন্ধ বাতাসে। দূরে খোলা একটা দরজা, ছায়া ছায়া অন্ধকার সেখানে। অস্পষ্ট আলোয় দেখি কোনো একটা কাঠামোর সঙ্গে কষে বেঁধে রাখা হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, লাল আর ব্যান্ডেজে মোড়ানো কিছু একটাকে। সব কিছু ঢেকে দিয়ে হঠাৎ উদয় হলো ডক্টর মরোর চেহারাটা, রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তেলতেলে আর আঠালো লাল দাগে-ভরা একটা হাত দিয়ে আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন তিনি, একঝটকায় ঘুরিয়ে দিলেন আমাকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপুড় করে ছুঁড়ে ফেললেন আমার ঘরে–যেন ছোট্ট একটা বাচ্চা আমি। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, বিদায় হলো মরোর উগ্র চেহারা। চাবি ঘুরিয়ে তালা মারার আওয়াজ শুনলাম।

দরজার ওপাশে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে মন্টগোমারি, ধমকে উঠলেন মরো, 'আমার সারাজীবনের কাজ বরবাদ করে দেবে।'

'লোকটা বোঝে না আসলে,' আরও কী সব যেন বলল মন্টগোমারি, ঠিকমতো শুনতে পেলাম না।

'নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার হাতে,' বললেন মরো।

আর কিছু কানে এল না। উঠে দাঁড়ালাম, অল্প অল্প কাঁপছি; অবিশ্বাস আর আশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে আছে মন। জন্তুজানোয়ার কেটে মন ভরেনি, এবার কি মানুষের ব্যবচ্ছেদ শুরু করেছেন মরো? বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো প্রশ্নটা জাগল মনে। যে-ভয়টা করছিলাম এ-ক'দিন, আরও বাড়ল সেটা এবার—বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমার।

এগারো

সামনের দরজাটা খোলা, তাই পালানোর অযৌক্তিক একটা চিন্তা এল মাথায়। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, "নর-ব্যবচ্ছেদ" শুরু করেছেন ডক্টর মরো। দ্বীপবাসীদের অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ভেবে বের করার চেষ্টা করছিলাম তাঁর নাম শোনার পর থেকেই, এখন মনে হয় ধরতে পেরেছি ব্যাপারটা। রক্তসঞ্চালনের উপর যে-গবেষণাটা করছিলেন তিনি লন্ডনে, সেটার কথা মনে পড়ে গেল। আধা-মানুষ আধা-পশু যাদেরকে দেখছি এই দ্বীপে, তারা আসলে বীভৎস এক গবেষণার বলি। বিজ্ঞানী মরো আমাকে ওরকম বানিয়ে দিলে কী হবে? শারীরিক বা মানসিক বা দু'ভাবেই একজন মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার

পরিণতি কী? মন্টগোমারির খাড়া কান আর জ্বলজ্বলে চোখের ওই চাকরের মতো, নাকি গতরাতে যে-লোকটা আমার পিছু নিয়েছিল তার মতো? আধা-মানুষ আধা-পশুর এই জীবন মরে যাওয়ার চেয়েও খারাপ। মনে পড়ল পুমাটার আর্তনাদ, কিছুক্ষণ আগে শোনা সেই গোঙানি—বুঝলাম, প্রথমে আমাকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে কাটাছেঁড়ার কাজ শেষ করবেন মরো, তারপর পরিণত করবেন আত্মাহীন করালদর্শন কোনো জন্তুতে, তারপর...ভাবতে পারলাম না আর।

অস্ত্রের খোঁজে তাকালাম চারদিকে। কিচ্ছু নেই। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়, লম্বা করে দম নিয়ে এগিয়ে গেলাম ডেকচেয়ারটার দিকে। কাছে গিয়ে একটা পা রাখলাম চেয়ারের একদিকে, হাতল ভেঙে আলগা করে নিলাম। কাঠের সঙ্গে খুলে এল চোখা একটা পেরেক, আরেকটু বিপজ্জনক হলো আমার ছোট্ট অস্ত্রটা।

বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়। স্থির থাকতে পারলাম না আর। প্রায় উড়ে গিয়ে একঝটকায় দরজাটা খুলে দেখি, তিন ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে মন্টগোমারি। ভিতরের দিকের দরজায় তালা মেরেছেন মরো, এবার বাইরের দরজাটাও আটকে দিয়ে আমাকে গৃহবন্দী করার মতলব নিয়ে এসেছে মন্টগোমারি! হাতের লাঠিটা-তুলেই বাড়ি মারলাম ওকে, কিন্তু লাফিয়ে সরে গেল সে। ইতস্তত করলাম একটা মুহূর্ত, তারপর ঘুরেই ছুটলাম বাড়ির এককোনা দিয়ে।

'প্রেনডিক!' বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মন্টগোমারি। 'বোকামি করবেন না!'

আর একটা মিনিট, দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবলাম, মাত্র একটা মিনিট সময় পেলেই আমাকে আটকে ফেলত সে। তারপর আমার

অবস্থা হতো গিনিপিগের মতো।

'প্রেনডিক!' চেঁচিয়ে আবারও আমাকে ডাকল মন্টগোমারি।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আমার পিছু পিছু ছুটে আসছে সে, আরও কী সব যেন বলছে। অন্ধের মতো দৌড়াচ্ছি আমি, গতরাতে যেদিকে গিয়েছিলাম তার থেকে সমকোণে উত্তর-পুবদিকে যাচ্ছি। সৈকত ধরে ছুটতে ছুটতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম আরেকবার, দেখি ভয়ালদর্শন সেই চাকরটাও যোগ দিয়েছে মন্টগোমারির সঙ্গে। গতি আরও বাড়ালাম, একটা ঢাল পার হয়ে বাঁক নিলাম পুবে। সামনে একটা পাথুরে উপত্যকা, সেটার দু'ধারে জঙ্গল।

দুর্বল দেহে একমাইলের মতো দৌড়ালাম—ভার হয়ে এল বুক একসময়, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বাড়ি মারতে লাগল কানে। পিছনে মন্টগোমারি বা ওর চাকরের কোনো পাত্তা নেই, আমিও পৌঁছে গেছি ক্লান্তির শেষসীমায়, তাই হঠাৎ ঘুরে ছুটতে লাগলাম যেদিকে যাচ্ছিলাম তার উল্টোদিকে, সম্ভবত সৈকত অভিমুখে। সামনে একটা বাঁশঝাড় দেখতে পেয়ে গিয়ে ঢুকলাম সেটার ভিতরে, শুয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকলাম ওই জঙ্গলে, নড়াচড়া করার সাহসটুকুও পেলাম না। ভেবে বের করতে পারছি না কী করা যায়। রোদের কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে চারদিকের বন্য প্রকৃতি। কাছেপিঠে শব্দ বলতে আমাকে-খুঁজে-পাওয়া একদল মশার ভনভন, আর দূরের সৈকতে তন্দ্রালু শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সাগরের মর্মর।

একঘণ্টা পর শুনি আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে মন্টগোমারি। অনেক দূরে, উত্তরদিক থেকে শোনা যাচ্ছে ওর কণ্ঠ। ওর ডাক শুনে কী করা যায় ভাবতে লাগলাম আবার। যতদূর বুঝেছি, এই দ্বীপে থাকে শুধু দুই "কসাই-বিজ্ঞানী", আর

তাদের পাগলামির কারণে মানুষ থেকে পশু হয়ে যাওয়া হতভাগ্য কয়েকজন লোক। প্রয়োজনে এদেরকে আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে দ্বিধা করবে না ওই দুই পাগল। জানি ওদের দু'জনের কাছেই রিভলভার আছে, আর আমার কাছে আছে চোখা পেরেকওয়ালা ছোট একটুকরো কাঠ। মুখোমুখি লড়াই-এ কে জিতবে কে হারবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং ওই বাঁশঝাড়ের ভেতরই শুয়ে থাকলাম। খাওয়ার চিন্তা মাথায় এল একসময়, তখন বুঝতে পারলাম আসলে কতটা অসহায় আমি। খাবার যোগাড় করা যায় কীভাবে জানি না। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এতই কম যে, আশপাশের কোন্ ফলমূল খাওয়ার উপযোগী বুঝতে পারছি না। গুটিকয়েক খরগোস আছে দ্বীপে, কিন্তু সেগুলোকেও ফাঁদ পেতে ধরার উপায় নেই। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না। শেষে বাধ্য হয়ে ভাবতে লাগলাম ওই পশুমানবদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক কিছু আছে কি না, ওদের দিয়ে আমার আদৌ কোনো উপকার হবে কি না।

হঠাৎ শুনি ঘেউ ঘেউ করছে একটা স্ট্যাগহাউন্ড, বুঝলাম নতুন বিপদ হাজির হয়েছে এবার। দেরি করলাম না আর, কাঠের টুকরোটা টেনে নিয়ে একদৌড়ে বের হলাম বাঁশঝাড় থেকে, সাগরের আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে ছুটে চললাম। পকেটনাইফের মতো কাঁটাযুক্ত একজাতের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়ানোর সময় চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত বের হতে লাগল আমার, কাপড় ছিঁড়ে গেল জায়গায় জায়গায়। ওই অবস্থায়ই হাজির হলাম উত্তরমুখী লম্বা একটা নদীর ধারে। এক মিনিটও দেরি না-করে নেমে পড়লাম পানিতে। নদীটা লম্বা হলেও চওড়ায় কম—প্রথমে হাঁটুপানিতে, পরে পশ্চিমদিকের তীরে গিয়ে উঠতে

বেশি সময় লাগল না আমার। কানে বাজছে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি, হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম কাছের এক ফার্নজঙ্গলে, কাপড় খানিকটা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। ঘেউ ঘেউ শুনে বুঝলাম আরও কাছে এসে পড়েছে কুকুরটা (মাত্র একটা কুকুর পিছু নিয়েছিল আমার), কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ে পৌঁছানোর পর আরও বাড়ল ওটার চিৎকার। তারপর হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল জন্তুটা, ভাবলাম পালাতে পেরেছি বোধহয়।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। যখন দেখলাম একঘণ্টার মতো পার হয়েছে অথচ কোনো বিপদ হয়নি আমার, একটু একটু করে অনেকখানি সাহস ফিরে পেলাম। খুব একটা ভয় লাগছে না এখন, নিজেকে আর আগের মতো দুর্দশাগ্রস্তও মনে হচ্ছে না। আরেকটু হলেই মরতে বসেছিলাম, শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে দুঃসাহসী একটা কাণ্ড ঘটিয়ে আসতে পেরেছি এতদূর। এমনকী ডক্টর মরোর মুখোমুখি হতেও ভয় লাগছে না এখন আর। ঘণ্টাখানেক আগেও যখন নদীতে নেমে পানি ঠেলে এগোচ্ছিলাম, মনে হয়েছিল নিদারুণ এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য ডুবে মরি। কিন্তু এই দ্বীপে আসলে যা ঘটছে সেটা জানার অদ্ভুত এক আগ্রহ বাধা দিয়েছিল আমাকে। কাঁটার খোঁচা খাওয়া হাত-পা ঝাড়া দিয়ে ব্যথা দূর করার চেষ্টা করলাম, আশপাশের গাছগুলোর দিকে তাকালাম। কালো একটা মুখ নজরে পড়ল হঠাৎ, আমাকেই দেখছে লোকটা—এত আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটল যে, মনে হলো সবুজ একটা নকশার ভিতর থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এল ওই চেহারা। চিনতে অসুবিধা হলো না—বানরমুখো এই লোকটাই সৈকতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লঞ্চের জন্য। একটা তালগাছের বাঁকা কাণ্ডের সঙ্গে অদ্ভুতভঙ্গিতে সেঁটে গিয়ে ঝুলছে সে। লাঠিটা আঁকড়ে ধরে উঠে

দাঁড়ালাম, মুখোমুখি হলাম লোকটার। পাখিদের মতো কিচিরমিচির করে কী সব যেন বলতে লাগল সে; 'আপনি, আপনি, আপনি,'–শুধু এই কথাগুলোই বুঝতে পারলাম প্রথমে। হঠাৎ গাছ থেকে নামল সে, একদিকে কাত করে ধরে রাখল কিছু ফার্নপাতা, উৎসুকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

অন্য পশুমানবদের যেমন দেখামাত্র ঘৃণায় রি রি করে উঠেছিল শরীর, একে দেখে কেন যেন সেরকম লাগছে না। 'আপনি,' বলল সে, 'নৌকায় ছিলেন।'

তারমানে মন্টগোমারির সেই চাকরের মতো কিছুটা হলেও মনুষ্যত্ব আছে এর মধ্যে, কারণ কিচিরমিচির করুক আর যা-ই করুক, ভুল বা শুদ্ধ যা-ই বলুক, কথা তো বলছে!

বললাম, 'হ্যাঁ, আমি নৌকায় ছিলাম। তার আগে ছিলাম একটা জাহাজে।'

উজ্জ্বল, চঞ্চল চোখে আমাকে আপাদমস্তক দেখল সে। তারপর দেখল আমার দু'হাত, লাঠিটা, পা-দুটো, আমার কোটের ছেঁড়া জায়গাগুলো, কাঁটার আঘাতে সৃষ্ট দেহের ক্ষতগুলো। মনে হলো এতকিছু একসঙ্গে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। আমার হাতের দিকে আবার তাকাল সে, তারপর নিজের হাতে আস্তে আস্তে গুনতে লাগল, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ...'

ওর এই "গণনা-পদ্ধতি"কে সম্ভাষণ করার কায়দা ভেবে নিয়ে আমিও ওরকম করলাম। তখন দেখি খুশিতে ওর দাঁত বের হয়ে গেছে। আরেকবার আমাকে আপাদমস্তক দেখল সে, তারপর চট করে ঘুরে জঙ্গলে ঢুকে উধাও হয়ে গেল। যে-ফার্নপাতাগুলোকে কাত করে ধরে রেখেছিল, সেগুলো আগের জায়গায় ফিরে এসে বাড়ি খেল একটা আরেকটার সঙ্গে।

ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে ওর পিছু নিলাম। কিছুদূর এগিয়েই

স্তম্ভিত হয়ে দেখি, গাছগাছড়ার অসংখ্য লতা দড়ির মতো ঝুলছে মাথার উপর, আর লম্বা সরু হাত দিয়ে সেরকম একটা আঁকাবাঁকা লতা ধরে মনের খুশিতে দোল খাচ্ছে লোকটা; আমার দিকে পিছন ফিরে আছে।

'হ্যালো!' বললাম আমি।

শরীরটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচড়ে লাফিয়ে নামল সে, এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

'কিছু খাবার দরকার আমার,' বললাম ওকে, 'কোথায় পাবো?'

'খাবেন! মানুষের খাবার খাবেন আপনি, এখনই!' যে-লতা ছেড়ে নেমে এসেছে এইমাত্র সেটা দোল খাচ্ছে, সেদিকে তাকাল সে। 'কুঁড়েঘরে খাবেন!'

'কিন্তু কুঁড়েঘরটা কোথায়?'

'ওই!'

'তুমি জানো আমি এই দ্বীপে নতুন, সব জায়গা ঠিকমতো চিনি না।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল লোকটা, দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। 'আসুন।'

আমাকে কোথায় নিয়ে যায় সে দেখতে ইচ্ছা হলো খুব, তাই পিছু নিলাম ওর। মনে হয় কুঁড়েঘর বলতে ভাঙাচোরা ছাউনিমতো কিছু একটা বুঝিয়েছে সে, হয়তো ওর মতো আরও কয়েকজন বানরমুখো পশুমানবকে নিয়ে সেখানেই থাকে। আশা করছি এর মতো ওরাও নিরীহ, খাতির-যত্ন না-করলেও অন্তত ক্ষতি করবে না আমার। কে জানে কতদিন আগে ওদেরকে মানুষ থেকে পশুতে রূপান্তরিত করেছেন ডক্টর মরো, তবে সময়টা যত কম হয় আমার জন্য তত ভালো।

স্বাভাবিক গতিতে পাশাপাশি হাঁটছি আমরা দু'জন। হাত

দুটো ঝুলে পড়েছে ওর, চোয়ালটা ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। স্মরণশক্তি বলে কিছু আছে কি না ওর মধ্যে ভাবলাম একবার। পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন ধরে আছো এই দ্বীপে?'

'কতদিন?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে আমাকে। প্রশ্নটা আরও একবার জিজ্ঞেস করে হাত তুলে তিনটা আঙুল দেখিয়ে দিল।

বুঝলাম, একেবারে হাবাগোবা নয় লোকটা। তিন আঙুল মানে তিন মাস নাকি তিন বছর জিজ্ঞেস করলাম ওকে, কিন্তু দেখে মনে হলো আমার প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হচ্ছে সে। আমার কৌতূহল তখন চরমে, তাই ওর বিরক্তি গায়ে না-মেখে আরও দুয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। কোনোটারই উত্তর না-দিয়ে হঠাৎ আমার পাশ থেকে সটকে পড়ল সে, লাফিয়ে গিয়ে চড়ল একটা গাছে, ঝুলন্ত কিছু কাঁটাযুক্ত ফল বা ফলের খোসা যা-ই হোক পেড়ে নিয়ে খেতে শুরু করল। গাছগুলো ভালোমতো চিনে রাখলাম, খাওয়া যায় এমন কিছু পাওয়া গেছে অন্তত। অন্য বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম ওকে, কয়েকটার উত্তর দিল সে, আবার কয়েকটার জবাবে তোতাপাখির মতো কিচিরমিচির করে কী বলল কিছুই বুঝলাম না।

এই অদ্ভুত লোকটার কাজকর্মে এতই তন্ময় হয়ে ছিলাম যে, কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় এসেছি, আর যাচ্ছিই বা কোথায় খেয়াল করিনি এতক্ষণ। চারদিকে তাকালাম এবার। যতদূর চোখ যায় শুধু গাছ আর গাছ–কয়লার মতো কালো কোনোটা, কোনোটা আবার বাদামি। জায়গাটা অনাবৃত, ভালোমতো তাকালে হলদে-সাদা একটা আবরণ চোখে পড়ে। বাতাসে ধোঁয়ার সূক্ষ্ম প্রবাহ। দমকা হাওয়ায় মাঝেমধ্যে মুখে এসে লাগছে সেই ধোঁয়া, চোখ-নাক জ্বালা করছে তখন। ডানে, নগ্ন একটা পাথরের উপর দিয়ে

দেখা যাচ্ছে নীল সাগরের একটা টুকরো। সর্পিলাকারে পাক খেয়ে হঠাৎ নীচের দিকে নেমে গেছে একটা বুনোপথ, জমাট কালচে লাভার গভীর কিন্তু সঙ্কীর্ণ এক উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। ওই পথ ধরে এগিয়ে চললাম আমরা দু'জন।

আশপাশের গন্ধকসমৃদ্ধ মাটিতে রোদ প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল এতক্ষণ, কিন্তু এই পথে ঘন অন্ধকার। সরু হতে হতে আমাদের দু'পাশের খাড়া দেয়াল একটার সঙ্গে আরেকটা প্রায়-লেগে গিয়ে আকাশটা ঢেকে দিয়েছে যেন। দু'দেয়ালের জায়গায় জায়গায় সবুজ আর গাঢ় লালের ফুসকুঁড়ির মতো ছোপ।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল আমার পথপ্রদর্শক, বলল, 'বাড়ি!'

থামলাম আমিও। পর্বতগাত্রের গভীর কোনো ফাটলের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছি বোধহয়। অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসে কিছুই দেখতে পেলাম না প্রথমে। অদ্ভুত কিছু আওয়াজ শুনতে পেলাম বলে মনে হলো, বাম হাত দিয়ে দু'চোখ ঢাকলাম। বাজে একটা গন্ধ লাগছে নাকে, চিড়িয়াখানায় বানরের অপরিষ্কার খাঁচার সামনে দাঁড়ালে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে হাত সরালাম চোখের উপর থেকে। ক্রমশ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে এই ফাটল; সামনে অবারিত আকাশ, সূর্যালোকিত শ্যামলিমা। দু'পাশের খাঁজ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঢুকছে আলো, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে-জায়গা অস্পষ্ট হয়ে আছে আধো অন্ধকারে।

বারো

ঠাণ্ডা কিছু একটা আমার হাত স্পর্শ করল তখন। চমকে উঠে দেখি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা গোলাপি জিনিস-দেখতে হুবহু বাচ্চাদের মতো। ওটার চেহারা স্লথের মতো কোমল কিন্তু কদাকার, কপাল নিচু আর অঙ্গভঙ্গি ধীরস্থির।

আলো সয়ে এসেছে চোখে, আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চারপাশ। স্লথের মতো দেখতে ছোট্ট প্রাণীটা পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। কখন যেন উধাও হয়ে গেছে আমার পথপ্রদর্শক। এই জায়গাটা আসলে লাভার খাড়া দেয়ালের মধ্যবর্তী সরু একটা প্যাসেজ, অন্যভাবে বললে পাহাড়ের গায়ে বিরাট একটা ফাটল। দু'ধারে জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছে রাশি রাশি সী-ম্যাট, তালপাতা আর নলখাগড়া; দুর্ভেদ্য আর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গুহা বানিয়ে ফেলেছে এই ফাটলটাকে। এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠে যাওয়া, তিন ফুটের মতো চওড়া পথটার জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে ফলের পচা খোসা আর অন্যান্য জঞ্জাল; দূষিত হয়ে গেছে পরিবেশ, বিশ্রী একটা গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

স্লথের মতো দেখতে ওই গোলাপি ছোট্ট প্রাণীটা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করছে এখনও। "বানর-মানব"কে দেখতে পেলাম আবার—গুহামুখের কাছে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায়

ডাকছে আমাকে। অলসভঙ্গিতে অদ্ভুত কায়দায় শরীরটা মোচড়াতে মোচড়াতে আরেকটা গুহা থেকে বের হলো কিম্ভূত এক জন্তু, কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থামল, উজ্জ্বল সবুজের পটভূমিতে আদলহীন এক ছায়ামূর্তির মতো তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। ইতস্তত করছি আমি, ফিরে যাবো কি না ভাবছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৌতূহলের কাছে আবার পরাজিত হলাম, লাঠিটা চেপে ধরে আমার পথপ্রদর্শকের পিছু পিছু হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলাম "কুঁড়েঘরে"।

জায়গাটা অর্ধবৃত্তাকার, মৌমাছি পালনের বাক্সের মতো দেখতে অনেকটা। ভিতরের পাথুরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে স্তূপ করে রাখা আছে অনেক-রকম ফল আর নারকেল। লাভা আর কাঠের বাতিল কিছু পাত্র পড়ে আছে মেঝেতে। আগুন জ্বলছে না কোথাও। ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোনায় বসে আছে কালো একটা আকৃতিহীন জিনিস, আমাকে ঢুকতে দেখেই "হেই!" বলে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে আরেক কোনার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, উবু হয়ে বসলাম। প্রবেশপথের অস্পষ্ট আলোয় দাঁড়িয়ে আমার দিকে একটুকরো নারকেল বাড়িয়ে দিল "বানর-মানব"। সেটা নিয়ে যথাসম্ভব ধীরস্থিরভাবে খেতে শুরু করলাম, যদিও সচকিত হয়ে আছি ভিতরে ভিতরে—এই ছোট্ট গুহার দম-বন্ধ-করা পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠছে ক্রমশ। গুহামুখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওই বাচ্চা শ্লথ-জন্তুটা, মেটে রঙ আর উজ্জ্বল চোখের অন্য কিছু একটা তাকিয়ে আছে ওটার কাঁধের উপর দিয়ে।

'হেই!' হঠাৎ বলে উঠল কালো রহস্যময় জিনিসটা, 'এ তো দেখি একটা মানুষ!'

'হ্যাঁ, মানুষ,' হড়বড় করে বলল আমার পথপ্রদর্শক, 'মানুষ,

মানুষ, পাঁচ আঙুলের মানুষ, আমার মতো।'

'চুপ!' ধমকাল কালো জিনিসটা, ঘোঁতঘোঁত করল আবার।

নারকেল খেতে খেতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে, কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখতে পেলাম না।

'হ্যাঁ, সে একজন মানুষ,' আবার বলল সে। 'আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছে নাকি?'

কণ্ঠটা ভারী, অদ্ভুত কী যেন একটা আছে এই কণ্ঠে—শিসের মতো, বরং কথার চেয়ে শিসটাই যেন বেশি বাজে কানে; কিন্তু ইংরেজি উচ্চারণটা আবার আশ্চর্যরকম ভালো।

আমার দিকে এমনভাবে তাকাল বানর-মানব, যেন কিছু আশা করছে। মনে হয় রহস্যময় ওই কণ্ঠের প্রশ্নটার উত্তর জানতে চায়। বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছি।'

'তাহলে ওকে আগে আমাদের আইনকানুন জানতে হবে।'

ঘুটঘুটে অন্ধকারের চেয়েও কালো, কুঁজোপিঠের আবছা একটি দেহরেখা যেন আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের সামনে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, হঠাৎ দেখি, আরও দুটো কালো মাথার কারণে অন্ধকার হয়ে আছে গুহামুখের কাছটা। আরেকটু শক্ত করে ধরলাম লাঠিটা।

রহস্যময় লোকটা জোরালো গলায় বলল, 'বলো।'

কী বলতে বলছে বুঝলাম না। তবে এটা বুঝলাম, আগে কিছু একটা বলেছিল সে; অন্যমনস্ক থাকায় শুনতে পাইনি।

'আমাদের আইন হচ্ছে—চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলা যাবে না।' একঘেয়ে কণ্ঠে কথাটা আবার বলল সে।

কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।

'বলুন,' অনুরোধ করল বানর-মানব, গুহামুখে দাঁড়ানো মূর্তিদুটোও শাসানির সুরে কথাটা বলতে বলল আমাকে।

বুঝলাম, অর্থহীন ওই বুলি আউড়াতেই হবে আমাকে, তাই বলে ফেললাম চটপট। সুর করে প্রার্থনা সঙ্গীত জাতীয় কিছু একটা বলতে শুরু করল রহস্যময় লোকটা, সেটার প্রতিটা লাইন গাইতে হলো আমাদেরকে। খেয়াল করলাম, গাওয়ার সময় শরীর দোলাচ্ছে ওরা, হাত দিয়ে চাপড় মারছে হাঁটুতে। ওদের দেখাদেখি আমিও করলাম ওরকম।

গানের ভাষা ইংরেজি হলেও কথাগুলো খুবই অদ্ভুত:

"চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলা যাবে না—এটাই আইন। আমরা কি মানুষ না?"

"মুখ ডুবিয়ে পানি খাওয়া যাবে না—এটাই আইন। আমরা কি মানুষ না?"

"মাছ-মাংস কিছুই খাওয়া যাবে না—এটাই আইন। আমরা কি মানুষ না?"

"আঁচড়ে গাছের ছাল তোলা যাবে না—এটাই আইন। আমরা কি মানুষ না?"

"অন্য মানুষদের ধাওয়া করা যাবে না—এটাই আইন। আমরা কি মানুষ না?"

কখন যেন ছন্দবদ্ধ এক ঐকান্তিকতা ভর করেছে আমাদের সবার উপর, হড়বড় করে গান গাইতে গাইতে সমানে দুলছি আমরা, উচ্চারণ আর দুলুনি দুটোরই গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, বিস্ময়কর কিছু আইন পুনরাবৃত্তি করতে করতে বলতে গেলে মুখে ফেনা এসে গেছে সবার। এসব আধা-পশু আধা-মানুষদের পাগলামি সংক্রমিত হয়েছে আমার মধ্যেও, ব্যঙ্গ আর বিরক্তির অদ্ভুত এক আবেগ কাজ করছে মনের ভিতরে। নিষেধাজ্ঞার লম্বা একটা তালিকা গেয়ে শেষ করার পর নতুন একটা গান ধরলাম আমরা; সেটার কথাগুলো আগেরটার চেয়েও অদ্ভুত, আরও বেশি

অর্থহীন:

"বেদনানিবাসে থাকেন তিনি।

"তিনিই স্রষ্টা।

"তিনিই আঘাত দেন।

"আবার তিনিই উপশম করেন।"

এই "তিনি"টা কে বুঝলাম না। একবার মনে হলো স্বপ্ন দেখছি বোধহয়। কিন্তু তখন খেয়াল হলো, জীবনে যত স্বপ্ন দেখেছি, সেগুলোতে আর যা-ই করি, আধা-পশু আধা-মানুষদের নিয়ে গান গাইনি কখনও।

"তিনিই বিদ্যুৎচমক," গেয়ে চললাম আমরা, "তিনিই সুগভীর লোনা সাগর।"

হঠাৎ ভয়াবহ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়–এই লোকগুলো যা আউড়াচ্ছে, তার সবই হয়তো ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন ডক্টর মরো। ওদেরকে মানুষ থেকে অমানুষ বানানোর পর ওদের স্বল্পবুদ্ধির মস্তিষ্কে নিজেকে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। কথাটা বোঝার পরও গান গাওয়া থামালাম না, কারণ রেগে গিয়ে কখন কী করে বসে এরা ঠিক নেই।

"তিনিই আকাশের তারা!"

অবশেষে শেষ হলো গানটা। ঘামে চকচক করছে বানর-মানবের মুখ, চোখে অন্ধকার সয়ে আসায় রহস্যময় কণ্ঠের মালিককে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন। আকার-আকৃতিতে মানুষের মতোই সে, তবে মনে হচ্ছে পুরো শরীর স্কাই-টেরিয়ার কুকুরের মতো নিষ্প্রভ ধূসর লোমে ঢাকা। জিনিসটা...নাকি বলবো মানুষটা...আসলে কী? আর এই লোকগুলোই বা কারা?

'সে আমারই মতো পাঁচ-আঙুলের মানুষ, পাঁচ-আঙুলের মানুষ, পাঁচ-আঙুলের মানুষ,' বলল বানর-মানব।

আমার হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে ধরলাম। কোনার ধূসর প্রাণীটা সামনে ঝুঁকে এল।

'চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলা যাবে না,' বলল সে, 'এটাই আইন। আমরা কি মানুষ না?'

আমার দিকে হাত বাড়াল সে, দেখলাম ওর হাতে বাঁকা আর লম্বা একটা নখ–হরিণের খুর যদি নখরে পরিণত হয় তাহলে যেরকম হবে অনেকটা সেরকম। বিস্ময় আর বেদনার মিশ্র একটা আবেগে চেঁচিয়ে উঠতাম আরেকটু হলেই, নখটা অদ্ভুত কায়দায় "সরিয়ে" আমার হাত ধরল বলে থেমে গেলাম। আরও ঝুঁকল সে, তাকাল আমার নখের দিকে; গুহামুখের আলোটা গিয়ে পড়ল ওর চেহারার উপর। যা দেখলাম তাতে কেঁপে উঠলাম আমি, ঘৃণায় রি রি করে উঠল শরীর। ওর চেহারাটা না-মানুষের না-পশুর, পুরো চেহারায় ধূসর ঝাঁকড়া চুলের জট, দু'চোখ আর মুখটা দেখা যায় কোনোরকমে।

'এর নখগুলো ছোট ছোট,' চুলের জঙ্গলের আড়াল থেকে বলল বীভৎস প্রাণীটা। 'ভালো।'

ধাক্কা দিয়ে আমার হাতদুটো সরিয়ে দিল সে, সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটা চেপে ধরলাম আমি।

বানর-মানব বলল, 'আপনাকে শুধু ফলমূল আর শাকসব্জি খেতে হবে। এটা তাঁর আদেশ।'

'ঠিক,' সায় জানাল গুহামুখে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটা প্রাণী।

'যারা মানবে না তাদের কপালে দুর্ভোগ আছে। কেউ বাঁচতে পারবে না।'

'ঠিক, কেউ বাঁচতে পারবে না।'

'কেউ না, কেউ না,' বলে চলল বানর-মানব, 'কেউ বাঁচতে পারবে না। একবার ছোট্ট একটা ভুল করেছিলাম আমি। বেশি

কথা বলে ফেলেছিলাম, তারপর এমন শাস্তি পেলাম যে, কয়েকদিনের জন্য কথা বন্ধ হয়ে গেল আমার। আমাকে পুড়িয়ে দিলেন তিনি–ছ্যাঁকা দিলেন আমার হাতে। তিনি মহান। তিনি ভালো!'

'হ্যাঁ, কেউ বাঁচতে পারবে না,' এবার মুখ খুলল "চুলের জঙ্গল"।

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' তাল মেলাল গুহামুখের কাছে দাঁড়ানো পশুমানবরা, একজন আরেকজনের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে ওরা।

'কামনা করা খারাপ না,' বলল আইনপ্রবক্তা ওরফে চুলের জঙ্গল, 'কিন্তু খারাপ জিনিস কামনা করা খারাপ। তোমার মনের মধ্যে কী আছে এই মুহূর্তে আমরা জানি না, কিন্তু তোমার কাজ দেখলেই জেনে যাবো। জীবন্ত কোনো প্রাণী দেখলেই চুপিসারে পিছু নেয় কেউ কেউ, অপেক্ষা করে, তারপর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কামড় দিয়ে খুন করে, রক্ত চুষে খায়। এই কাজটা খারাপ। মনে রাখতে হবে–"অন্য মানুষদের খাওয়া করা যাবে না, এটাই আইন, আমরা কি মানুষ না?" "মাছমাংস কিছুই খাওয়া যাবে না, এটাই আইন, আমরা কি মানুষ না?"'

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' গুহামুখের কাছে দাঁড়ানো এক পশুমানব বলল আবার।

'কেউ কেউ আবার দাঁত বা হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে জিনিসপত্র, নাক মাটিতে লাগিয়ে গন্ধ শুঁকে। এই কাজগুলোও খারাপ।'

'কেউ বাঁচতে পারবে না।'

'গাছের গায়ে আঁচড় কাটে কেউ, কেউ আবার মরা-মানুষের কবর খোঁড়ে। পা বা নখ দিয়ে মাছ ধরে কেউ, কেউ আবার কথা

নেই বার্তা নেই হঠাৎ কামড়ে দেয়, আবার কেউ নোংরা থাকতে পছন্দ করে।'

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' পা চুলকাতে চুলকাতে বলল বানর-মানব।

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' গোলাপি ছোট্ট শুশ-জন্তুটা বলল, কখন যেন গুহামুখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওটা।

'শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কী করা যাবে আর কী করা যাবে না শিখে নাও। আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো আবার।'

আবার শুরু হলো ওর একঘেয়ে গান। বলা বাহুল্য আমরাও গলা মেলালাম ওর সঙ্গে, গানের তালে তালে দুলতে লাগলাম। আইনকানুনের নামে অর্থহীন উদ্ভট কথাবার্তা শুনতে শুনতে আর পুনরাবৃত্তি করতে করতে মাথা ঘোরাতে শুরু করল আমার, কিন্তু তারপরও থামলাম না, শেষপর্যন্ত কী করে এই পশুমানবরা দেখা যাক।

আমরা এত জোরে গান গাইছি যে, বাইরের কোনো শব্দই শুনতে পাচ্ছি না। শুয়োরের মতো দেখতে যে-দু'জন পশুমানবকে দেখেছি এ-পর্যন্ত, সম্ভবত তাদের একজন গুহামুখের কাছে উদয় হলো, গোলাপি ছোট্ট শুশ-জন্তুটার উপর দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল ভিতরে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে কী যেন বলল। ওর কথার কিছুই বুঝলাম না। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হলো গুহামুখের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পশুমানব, বানর-মানবও একছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। এতক্ষণ অন্ধকারে এককোনায় বসে ছিল যে-জিনিসটা, সেটাও দৌড় দিল এবার। (একপলকের জন্য দেখলাম, জিনিসটা যেমন বিশাল তেমন কদাকার: বড় বড়, ঘন, রুপালি লোমে ভরা সারা শরীর) গুহার ভিতরে একা বসে থাকলাম আমি কিছুক্ষণ। বাইরে যাওয়ার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলাম একটু

পর, কিন্তু গুহামুখের কাছে পৌঁছানোর আগেই শুনি ঘেউ ঘেউ করছে একটা স্ট্যাগহাউন্ড।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে, শক্ত করে ধরে আছি চেয়ারের হাতলটা, উত্তেজনায় কাঁপছে আমার সব পেশী। জনা বিশেক পশুমানব আমার দিকে পিছন-ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, শোল্ডারব্লেডের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে সবার মাথা। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়ছে সবাই। আশপাশে আরও কয়েকটা গুহা, সেগুলোর ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে আরও কিছু আধা-পশু আধা-মানুষ। সবারই চোখে-মুখে নির্বাক প্রশ্ন। ওরা যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে তাকালাম আমিও। দেখি, সরু প্যাসেজটার শেষমাথায় কুয়াশার মতো অস্পষ্ট হয়ে আছে একসারি গাছ; প্রাকৃতিক সেই পটভূমিতে স্ট্যাগহাউন্ড-নিয়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা ডক্টর মরোর দেহকাঠামো যেমন স্পষ্ট, সাদা চেহারাটা তেমনই ভয়ঙ্কর। তাঁর ঠিক পাশে, একটু পিছনে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে মন্টগোমারি।

ভয়ে জমে গিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম একটা মুহূর্ত। সংবিৎ ফিরে পাওয়ামাত্র ঘুরলাম, কিন্তু পিছনের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট ধূসর চেহারা আর মিটমিটে ছোট চোখের বিশাল এক পশুমানব, এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, ডানে, ছ'গজ সামনে পাহাড়ের গায়ে সরু একটা ফাটল, সেটা দিয়ে তির্যকভাবে ভিতরে ঢুকছে আলোকরশ্মি।

'থামুন!' আমাকে ফাটলটার দিকে এগোতে দেখে চিৎকার করে উঠল মরো, কিন্তু ওর কথা কানে তুললাম না দেখে আবার চেঁচাল, 'তোমরা ধরো ওকে!'

আদেশ পাওয়ামাত্র ধীরেসুস্থে আমার দিকে ঘুরল এক

পশুমানব, তারপর বাকিরাও। জানি না কেন তাড়াহুড়ো করছে না কেউই। সুযোগটা নিলাম—কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা দিলাম কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কিম্ভূত এক পশুমানবকে। উড়ে গিয়ে আরেক কদাকারের উপর পড়ল সে। আমাকে ধরার জন্য হাত চালিয়েছিল বেচারা, বাতাস ছাড়া আর কিছু ঠেকল না সে-হাতে। আমার দিকে ছুটে এল গোলাপি ছোট্ট স্লথ-জন্তুটা, হাতের লাঠি দিয়ে বাড়ি মারলাম ওটাকে, পেরেকটা গিয়ে লাগল, কুৎসিত চেহারায় বিশ্রী একটা কাটা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সেটা। একটু পর হামাগুড়ি দিতে দিতে চিমনির-মতো-খাড়া একটা পথ বেয়ে চলে গেল এই উপত্যকার বাইরে। পিছনে একটা হুঙ্কার শুনতে পেলাম এমন সময়, "ধরো!" "আটকাও!" বলে সমবেতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল পশুমানবের দল। আমাকে ছাড়িয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গেল ধূসরমুখো সেই দানব, নিজের বিশাল শরীর ঠেসে ধরে আটকে দিল ফাটলটা।

"ধরো! ধরো!" গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে পশুমানবরা।

সামনের রাস্তা বন্ধ, তাই ভিন্ন কায়দা খাটাতে হলো। হাত-পায়ের আঙুল কাজে লাগিয়ে টিকটিকির মতো বেয়ে উঠলাম পাথরের দেয়াল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ওই ফাটল টপকে নেমে এলাম বাইরের গন্ধকসমৃদ্ধ মাটিতে, পশুমানবদের "গ্রামের" পশ্চিমদিকে।

ফাটল আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালবপুর জন্তুটা শতচেষ্টা করলেও বের হতে পারবে না সেখান দিয়ে, আবার খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠে এসে এখানে হাজির হতেও অনেক সময় লাগবে ভারী শরীরের কারণে। বেশিরভাগ পশুমানবই ওর মতো, তাই আমাকে ধরা এখন সহজ নয় ওদের জন্য।

চারদিকের সাদাটে মাটির উপর দিয়ে দৌড়ে চললাম। খাড়া

একটা ঢাল বেয়ে নামলাম, বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালার ভিতর দিয়ে এগোলাম লম্বা লম্বা নলখাগড়ার বিস্তৃত একটা জঙ্গলের দিকে। এ-জায়গার মাটিতে গজিয়ে আছে ঘন কালো একজাতের গুল্ম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ফাটলের এপাশে মাত্র বেরিয়ে এসেছে পশুমানবরা, এবার পিছু নেবে আমার। দেরি না-করে ঢুকে পড়লাম নলখাগড়ার জঙ্গলে, টানা কয়েক মিনিট এগিয়ে চললাম। আশপাশের বাতাসে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ। পিছনের ঢালে তুমুল হুড়াহুড়ি শুরু করে দিয়েছে আমার ধাওয়াকারীরা, মড়মড় শব্দে নলখাগড়া ভেঙেচুরে এগিয়ে আসছে। এমনভাবে গর্জন করছে কেউ কেউ যেন শিকারের পিছু নিয়েছে। বামদিক থেকে ভেসে আসছে স্ট্যাগহাউন্ডটার ঘেউ ঘেউ। ওই একই দিক থেকে শুনতে পেলাম ডক্টর মরো আর মন্টগোমারির চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে দিক পাল্টে রওয়ানা হলাম ডানে। নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, তবে একবার মনে হলো চেঁচিয়ে বলছে মন্টগোমারি, 'পালান, প্রেনডিক, পালান।'

পায়ের নীচের মাটি এখন কর্দমাক্ত; দৌড়ানো তো দূরের কথা, ঠিকমতো হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই আমার, নীচের দিকে তাকিয়ে ছুটছি আগের চেয়ে ধীরগতিতে। লম্বা লম্বা আখ গাছের একটা জঙ্গল সামনে, সেটার ভিতরে ঢুকে এগোলাম আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে। এখন বামদিক থেকে আসছে ধাওয়াকারীদের আওয়াজ। আখক্ষেতের একদিকে দেখি গোলাপি রঙের তিনটা অদ্ভুত প্রাণী, আকারে বিড়ালের সমান—আমার পায়ের শব্দ পেয়ে লাফিয়ে ছুটে পালাল। খেয়াল করলাম যত এগোচ্ছি ধীরে ধীরে খাড়া হতে হতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে পথটা। শেষমাথায় পৌঁছে দেখি হাজির হয়েছি সাদাটে-আবরণে-ঢাকা উন্মুক্ত একটা প্রান্তরে, আর পথটা গিয়ে ঢুকেছে আরেকটা

আখক্ষেতে। এই ক্ষেতের পরে কী আছে ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করলাম না, দৌড়াতে লাগলাম আগের মতো। খেয়ালই করলাম না কখন যেন তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে ফুরিয়ে গেল পথটা, ফুরিয়ে গেল পায়ের নীচের মাটিও, হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম নীচে পড়ে যাচ্ছি আমি।

আছড়ে পড়লাম কতগুলো কাঁটাগাছের উপর, ধাক্কাটা লাগল দু'হাতের কনুই আর মাথায়। দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালাম। কানের কাছটা আর মুখের একপাশ কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, খাড়া আর সরু এক উপত্যকায় পড়েছি। জায়গাটা পাথুরে আর কাঁটাগাছে ভরা। কুণ্ডলীর মতো পাক খেয়ে চারপাশে ভাসছে জলীয় বাষ্প। অনতিদূরে ছোট্ট একটা জলপ্রপাত, জলীয় বাষ্পের উৎসস্থল। দিনের বেলায় উজ্জ্বল রোদে বাষ্পের কুণ্ডলী দেখে অবাকই হলাম। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির লীলা দেখার সময় নেই, তাই ডানে মোড় নিয়ে জলপ্রপাতে-সৃষ্ট ক্ষীণ জলধারা বরাবর এগিয়ে চললাম। এভাবে এগোলে সাগরের ধারেকাছে পৌছাতে পারবো হয়তো। এই দ্বীপে বাঁচার কোনো উপায় নেই আমার, তাই সাগরের তীরে পৌছাতে পারলে ডুবে মরার সুযোগটা পাবো অন্তত। কিছুদূর এগোনোর পর খেয়াল হলো, পড়ার সময় হাত থেকে ছুটে গেছে একমাত্র অস্ত্র লাঠিটা। কাঁটাগাছের জঙ্গলে ফিরে গিয়ে জিনিসটা খোঁজা হবে চূড়ান্ত বোকামি; কারণ খড়ের গাদা থেকে সুঁই খুঁজে পেলেও মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, তাছাড়া এতগুলো বিশালাকৃতির পশুমানবের বিরুদ্ধে সামান্য একটা চেয়ারের-হাতল দিয়ে আসলে কিছুই করতে পারবো না। আরও বড় কথা, পালাতে বলুক আর যা-ই বলুক, রিভলভার আছে মন্টগোমারির কাছে; মরোর আদেশে সে যে গুলি করবে না আমাকে তার নিশ্চয়তা কী?

যত এগোচ্ছি তত সরু হচ্ছে উপত্যকাটা। অগ্র-পশ্চাৎ না-ভেবেই হঠাৎ নেমে পড়লাম ছোট্ট নদীটাতে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে আসতে হলো-নদীর পানি আগুনের মতো গরম। খেয়াল করলাম, ক্ষীণ এই জলধারাতেও ঘূর্ণি জেগেছে, গন্ধকের ফেনা ভেসে যাচ্ছে সেই ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে। আরও কিছুদূর এগোনোর পর হঠাৎ শেষ হয়ে গেল উপত্যকাটা, দূরের অস্পষ্ট দিগন্তটা পাল্টে গিয়ে নীল একটা ছায়ার রূপ ধারণ করল যেন। উজ্জ্বল আলোয় রত্নপাথর যেভাবে চমকায়, দিগন্তঘেঁষা সমুদ্রটাও যেন প্রখর রোদে দ্যুতি ছড়াচ্ছে সেভাবে। পৌঁছে গেছি মৃত্যুর দরজায়, কিন্তু এখনই ছুটে গিয়ে ডুবে মরার মতো শক্তি নেই-এতদূর দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে গেছি খুব, গরমে মনে হচ্ছে পুড়ে যাবে শরীরটা, শিরা-উপশিরায় পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে করতে শেষে চেহারার ক্ষত দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত। নীরব একটা বিজয়োল্লাস মনে-অনেক পিছনে ফেলে এসেছি ধাওয়াকারীদেরকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। কেউ নেই। কান পাতলাম। ছোট কিছু পতঙ্গ আর মশার ভনভন ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। বাতাস একেবারে স্থির। খুবই ক্ষীণ কিছু শব্দ শুনতে পেলাম এমন সময়-ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর, অদ্ভুত ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে পশুমানবরা, কিন্তু এতদূর থেকে পাখির কিচিরমিচিরের মতো শোনাচ্ছে ওদের কথোপকথন, সপাং সপাং করে চাবুক চালাচ্ছে কেউ। কাছে চলে এল শব্দগুলো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই নিস্তেজ হয়ে পড়ল আবার, তারপর মিলিয়ে গেল একসময়। বুঝলাম, এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম; কিন্তু মরোর হাত থেকে চিরতরে রেহাই পাওয়ার জন্য পশুমানবদের সাহায্য নেয়ারও সুযোগ থাকল না আর।

তেরো

ঘুরে সাগরের দিকে রওয়ানা হলাম আবার। গরম পানির নদীটা চওড়া হচ্ছে ধীরে ধীরে, আগাছায় ভরা অগভীর একটা জলাশয় বলা যায় সেটাকে এখন। লম্বা শরীর আর বহুপদের বিভিন্ন জাতের ছোট ছোট প্রাণী এবং কাঁকড়ায় ভরা এ-জায়গার মাটি। হাঁটতে হাঁটতে যখন লোনাপানির স্পর্শ লাগল পায়ে, নিজেকে নিরাপদ মনে হলো কেন যেন। কোমরে হাত রাখলাম, ঘুরে তাকালাম দূরের ঘন শ্যামলিমার দিকে। বাষ্পে ভরা সঙ্কীর্ণ ওই উপত্যকাটাকে দেখতে লাগছে গভীর একটা ধোঁয়াটে ক্ষতের মতো। কিন্তু প্রকৃতির এই রূপ-সৌন্দর্য একটুও ভালো লাগছে না, চরম উত্তেজনা আর নিদারুণ হতাশায় আশা-ভরসা ভয়-ডর সব চলে গেছে, পানিতে ডুবে মরার জন্য মরিয়া আমি এখন। (আমার মতো বিপদে যারা পড়েনি কখনও, তারা হয়তো কথাটা বিশ্বাসই করবে না।)

হঠাৎ মনে হলো, একটা উপায় আছে বোধহয়। জানি এখনও হন্যে হয়ে সারা দ্বীপে আমাকে খুঁজছে ডক্টর মরো, মন্টগোমারি আর ওদের অনুচর পশুমানবরা। তারমানে ধরে নেয়া যায় বাড়িটা খালি। সৈকত ধরে ঘুরপথে এগিয়ে ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওই বাড়িতে যেতে পারবো হয়তো। তারপর নড়বড়ে দেয়াল থেকে টেনেহিঁচড়ে একটা পাথর আলগা করে নিয়ে ছোট দরজাটার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকবো। ছুরি, পিস্তল বা এ-জাতীয় কিছু একটা

খুঁজবো। মরো আর মন্টগোমারির সঙ্গে বেশি হলে দুই কি তিনজন পশুমানব ফিরবে বাড়িতে, হঠাৎ হামলা করে ওদেরকে কাবু করে ফেলার সুযোগ পেয়েও যেতে পারি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমার, আগে বাড়লেও মরণ পিছু হটলেও মরণ–কাজেই পিছু হটার চেয়ে আগে বাড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দিক পাল্টে মোড় নিলাম পশ্চিমে, পানির কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলাম। সূর্য ডুবছে, কিন্তু তারপরও রোদের তেজ এতটুকু কমেনি–তীব্র আলোয় অন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার। ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে স্নিগ্ধ কলতানে। সামনে, দক্ষিণে বাঁক নিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে সাগরের তীর। এগিয়ে চললাম, সূর্যটা এখন আমার ডানদিকে। হঠাৎ দূরের কতগুলো ঝোপ থেকে একে একে উঠে দাঁড়াল কয়েকটা মানবমূর্তি–প্রথমে ধূসর-স্ট্যাগহাউন্ড-সঙ্গে-নিয়ে মরো, তারপর মন্টগোমারি, সবশেষে দুই পশুমানব। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

আমাকে দেখে ফেলেছে ওরা, এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়েই আছি আমি, দেখছি ওদেরকে। সমুদ্র তীরবর্তী জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে শুরু করল দুই পশুমানব, যাতে সেখানে গিয়ে ঢুকতে না-পারি আমি। মন্টগোমারি ছুটে আসছে সোজা আমার দিকে। ডক্টর মরোও দৌড়াচ্ছেন, তবে ধীরগতিতে, কুকুরটা সঙ্গে নিয়ে।

জড়তা কাটিয়ে উঠলাম অবশেষে। বুঝতে পারছি আর কোনো আশা নেই আমার, ডুবে মরা ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। তীর ধরেই হাঁটছিলাম, এবার ঘুরে কয়েক কদম এগিয়ে সোজা নেমে পড়লাম পানিতে। কিন্তু সমুদ্রটা এখানে যে এত অগভীর, কল্পনাও করিনি। ত্রিশ গজ মতো এগোনোর পর কোমর পর্যন্ত ডুবল। জোয়ারের টানে পানির সঙ্গে ছুটে আসছে সামুদ্রিক কিছু

প্রাণী, অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওগুলোকে।

'কী করছেন আপনি, প্রেনডিক?' পিছন থেকে শুনতে পেলাম মন্টগোমারির চিৎকার।

ঘুরে তাকালাম ওর দিকে। পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সে। এত দৌড়াদৌড়ি করে টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা, এলোমেলো হয়ে আছে বড় বড় হলুদ চুল, নীচের ঠোঁট আরও ঝুলে পড়ায় দেখা যাচ্ছে উঁচু-নিচু দাঁত। ডক্টর মরোও অনেক কাছে এসে পড়েছেন, ফেকাসে দেখাচ্ছে তাঁর কঠিন চেহারাটা, সঙ্গের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে আমাকে দেখে। খেয়াল করলাম, দু'জনের হাতেই ভারী চাবুক। অনেক দূরে, জঙ্গলের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে দুই পশুমানব।

'কী করছি?' শান্তকণ্ঠে বললাম, 'আত্মহত্যা। ডুবে মরবো আমি।'

মন্টগোমারি আর মরো একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। মরো বললেন, 'কেন?'

'কারণ আমাকে ধরতে পারলে গবেষণার নামে কাটাছেঁড়া শুরু করবেন আপনি, তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মানুষ থেকে জানোয়ার বানিয়ে দেবেন। এত বড় যন্ত্রণা পাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।'

মরোর দিকে তাকাল মন্টগোমারি। 'আগেই বলেছিলাম আপনাকে।'

নিচু কণ্ঠে কী যেন বললেন মরো, শুনতে পেলাম না।

'আপনাকে...কাটাছেঁড়া করে জানোয়ার বানাবো আমি কে বলল?' জানতে চাইলেন মরো।

'কেউ বলেনি। আমি নিজেই অনুমান করে নিয়েছি।'

'অনুমানটা করলেন কীভাবে?'

'দেখে,' দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলাম, 'ওদের মতো আরও অনেক পশুমানবকে দেখে।'

'চুপ!' ধমকে উঠলেন মরো, আমাকে থামিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত তুললেন।

'না, চুপ করবো না। আমি জানি ওই জন্তুগুলো মানুষ ছিল এককালে। আপনি ওদের কী অবস্থা করেছেন দেখুন একবার। ওদের মতো হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।'

মরো আর মন্টগোমারিকে ছাড়িয়ে তাকালাম দূরে, সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পশুমানবের দিকে। চিনতে পারলাম একজনকে–মন্টগোমারির চাকর, পরে জেনেছিলাম লোকটার নাম ম্লিং। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জন্তুটা সম্ভবত লঞ্চে করে মাল খালাস করতে গিয়েছিল যারা তাদের কেউ। আরও দূরে, জঙ্গলের ভিতরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে বানর-মানব, ওর পিছনে আরও কতগুলো অস্পষ্ট মূর্তি।

আঙুল তুলে ইশারা করলাম ওদের দিকে, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' কণ্ঠ আরও উঁচু করলাম যাতে দূরের ওই জন্তুগুলোও শুনতে পায়, 'আমার-আপনার মতোই মানুষ ছিল একসময়। জানি না বিজ্ঞানের জোরে কোন্ কৌশল আবিষ্কার করে প্রয়োগ করেছেন ওদের উপর–মানুষ থেকে পশু হয়ে গেছে ওরা। ওদেরকে নিজের দাস বানিয়েছেন, কিন্তু আবার ভয়ও পান; তাই ওদেরকে বনেজঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে নিজে থাকেন সুরক্ষিত এক বাড়িতে, চাবুক-পিস্তল এসব নিয়ে ঘুরে বেড়ান।' আবার তাকালাম পশুমানবদের দিকে, আঙুলের ইশারায় মরোকে দেখিয়ে বললাম, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা? বুঝতে পারছ? এই লোকটা যে তোমাদেরকে ভয় পায় জানো? তাহলে তোমরা কেন একে ভয় পাও? তোমরা সংখ্যায় অনেক...'

'ঈশ্বরের দোহাই,' চেঁচিয়ে উঠল মন্টগোমারি, 'চুপ করুন, প্রেনডিক!'

'প্রেনডিক!' আবার ধমক দিলেন মরো।

একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ওরা দু'জন যাতে আমার গলার আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা পশুমানবদের সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল, বিকৃত হাত ঝুলে পড়ল শরীরের দু'পাশে। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা এতক্ষণ, এখন কেমন যেন কুঁজো কুঁজো লাগছে সবাইকে। মনে হয় আমার কথা বোঝার চেষ্টা করছে ওরা, স্মরণ করার চেষ্টা করছে নিজেদের "মানব-অতীত"।

পশুমানবদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে গেলাম একটানা, কিন্তু কী বলেছিলাম ঠিকমতো মনে পড়ছে না এখন। হয়তো বলেছিলাম ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, মরো আর মন্টগোমারিকে খুন করা সম্ভব। বোধহয় আমার কথা আরেকটু ভালোমতো শোনার জন্য জঙ্গল ছেড়ে বের হয়ে এল দু'-একজন পশুমানব, কিছুদূর এগিয়ে এসে থেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। চেঁচাতে চেঁচাতে হাঁপিয়ে গেলাম একসময়, দম নেয়ার জন্য থামলাম।

'আগে আমার একটা কথা শুনুন,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মরো, 'তারপর যত খুশি চেঁচান।'

'কী কথা?'

কিছুক্ষণ কাশলেন তিনি, কী যেন ভাবলেন, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, 'ল্যাটিনে বলবো, প্রেনডিক! ভাষাটা ভালো বলতে পারি না আমি, তবে চেষ্টা করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না আপনার। হাই *নন সান্ট হোমিনিস; সান্ট অ্যানিমালিয়া কুই নস হাবেননাস*—অস্ত্রোপচার করেছি আসলে। মানুষ বানানোর একটা উপায় বলতে পারেন। পরে বুঝিয়ে বলবো আপনাকে। পানি

থেকে উঠে আসুন এখন।'

হাসলাম আমি। 'চমৎকার একটা গল্প শোনালেন, যা-হোক। বিজ্ঞানী না-হয়ে ঔপন্যাসিক হলেও ভালো নাম কামাতে পারতেন।...ওরা কথা বলতে পারে, ঘরবাড়ি বানায়। আমাকে মেরে কেটে ফেললেও বিশ্বাস করবো না আগে মানুষ ছিল না ওরা। আর তীরে আসার কথা বলছেন? আগেও একবার বলেছি আপনার হাতে ধরা পড়ার চেয়ে ডুবে মরা অনেক ভালো।'

'আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার ঠিক পিছন থেকেই গভীর হয়েছে সাগর, জায়গাটাও হাঙরে ভরা।'

'মরণ যেভাবে লেখা আছে কপালে সেভাবে হবেই, হাঙর-ফাঙর কোনো ব্যাপার না।' আরও কিছুটা পিছিয়ে গেলাম, বুক পর্যন্ত ডুবে গেল আমার।

'এক মিনিট দাঁড়ান,' পকেট থেকে চকচকে কিছু একটা বের করলেন মরো, রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল জিনিসটা। হাত থেকে ছেড়ে দিলেন, তাঁর পায়ের কাছে পড়ল সেটা। 'আমার গুলি-ভরা রিভলভার,' বললেন তিনি। 'মন্টগোমারিও ওর রিভলভার ফেলে দেবে। তারপর দূরে সরে যাবো আমরা, পানি থেকে উঠে এসে অস্ত্রদুটো তুলে নেবেন আপনি। ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই। আপনার কাছে যে আরেকটা রিভলভার নেই তার নিশ্চয়তা কী?'

'কয়েকটা ব্যাপার ভেবে দেখুন, প্রেনডিক। আইপেকাকুয়ানহায় দেখা হলো আপনার সঙ্গে—আমি কিন্তু আপনাকে এখানে আসার কথা বলিনি একবারও। যদি আমি মানুষ নিয়ে গবেষণা করতাম, যদি আপনার কথামতো মানুষদের "কাটাছেঁড়া" করে জন্তুজানোয়ার বানাতাম, তাহলে কিছু দিন পর পর মানুষ নিয়ে আসতে হতো আমাকে, জন্তু না। কিন্তু জাহাজ

থেকে লঞ্চে যত মালপত্র তুলেছি, হাত-পা বাঁধা একটা মানুষও কি ছিল কোনোটাতে? গতকাল দ্বীপে ঘোরাঘুরি করে এমন কিছু দেখলেন, যার কারণে ঘরে ফিরেই মরো-মরো অবস্থা হলো আপনার। যদি খারাপ কোনো উদ্দেশ্য থাকত আমার, তাহলে ইচ্ছা করলেই তখন বন্দী করতে পারতাম আপনাকে, মন্টগোমারিকে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করে তুলতাম না। আমার কথা না-হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মন্টগোমারি? সে কি একবারও খারাপ ব্যবহার করেছে আপনার সঙ্গে? এই যে সকাল থেকে আপনাকে ধরার জন্য সারা দ্বীপে ছোটাছুটি করছি আমরা—কেন? আপনার ভালোর জন্যই। আপনি জানেন না—অদ্ভুত কিন্তু ক্ষতিকর কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে এই দ্বীপে। আরও বড় কথা, আপনি যখন ডুবে মরার জন্য এক পায়ে খাড়া, তখন আর আপনাকে গুলি করে কী লাভ?'

'কিন্তু আপনার লোকগুলোকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিলেন কেন?'

'যাতে সহজেই ধরা যায় আপনাকে, যাতে কোনো বিপদ না-হয় আপনার।'

ভেবে দেখলাম ব্যাপারটা। বোধহয় সত্য কথাই বলছেন মরো। কিন্তু আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় বললাম, 'কিন্তু আপনার বাড়িতে...উঠান পার হয়ে...'

'ওটা পুমা, মানুষ না।'

'প্রেনডিক,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল মন্টগোমারি, 'আপনি আসলে একটা বোকা। আর দেরি না-করে উঠে আসুন পানি থেকে। আমাদের রিভলভার দুটো নিন, তারপর যা যা জানতে চান জিজ্ঞেস করুন। আপনার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারি আমরা?'

মনভুলানো যত কথাই বলুন ডক্টর মরো, কেন যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। দেখলেই ভয় লাগে। কিন্তু মন্টগোমারি আবার অন্যরকম–সহমর্মী সহমর্মী একটা ভাব আছে ওর মধ্যে। সুতরাং মন্টগোমারি যখন রিভলভার নেয়ার কথা বলল, ভাবলাম আমার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই বোধহয় ওদের। বললাম, 'ঠিক আছে, দূরে সরে যান তাহলে দু'জনই। আর...মাথার উপর তুলে রাখবেন হাত।'

'সম্ভব না,' ইশারায় নিজের কাঁধ দেখাল মন্টগোমারি, 'ব্যথা করছে এমনিতেই।'

'তাহলে পিছু হটে জঙ্গলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।'

'ধেৎ!' বিড়বিড় করতে করতে উল্টো ঘুরল মন্টগোমারি, পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফেলে দিল বালির উপর। ডক্টর মরোও ঘুরলেন। ছয় কি সাতজন পশুমানবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা এখন। মানুষ আর আধা-মানুষের অবিশ্বাস্য কিন্তু বাস্তব এক প্রদর্শনী চলছে যেন আমার সামনে। রোদে দাঁড়িয়ে থাকা বলিষ্ঠ জন্তুগুলোকে কেমন মূর্তি মূর্তি লাগছে। থেকে থেকে নড়ে উঠছে ওরা, তখন মনে হচ্ছে প্রাণ আছে ওদের শরীরে।

হাতের চাবুকটা সপাং করে বাতাসে চালাল মন্টগোমারি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেই এলোপাথারি দৌড় দিল আধা-পশু আধা-মানুষের দল, একছুটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকল সবাই। ডক্টর মরোকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল সে। যখন আমার মনে হলো দূরত্বটা যথেষ্ট নিরাপদ, পানি থেকে উঠে এলাম তীরে। রিভলভার দুটো তুলে নিয়ে পরখ করে দেখলাম। চতুর মরো কোনো চাল চেলেছেন কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য গুলি করলাম লাভার একটা গোল স্তূপের উপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেল স্তূপটা, সৈকতের বালিতে ছড়িয়ে পড়ল আকরিক সীসা। সন্তুষ্ট হলাম, কিন্তু

তারপরও দ্বিধা গেল না আমার।

'ঝুঁকিটা নেবো,' বিড়বিড় করে বললাম নিজেকেই, তারপর দু'হাতে দুটো রিভলভার নিয়ে এগিয়ে গেলাম ডক্টর মরো আর মন্টগোমারির দিকে।

'ভালো,' মরোর কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'বোকার মতো কল্পনা আর কাজ করে আমার পুরো একটা দিন মাটি করলেন আপনি।' অবহেলার দৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক দেখলেন তিনি, তারপর ঘুরে চলে গেলেন, আর একটা কথাও বললেন না। কয়েকটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মন্টগোমারি, তারপর মরোর পিছু নিল। ওদের এই অবজ্ঞায় অপমানিত বোধ করলাম খানিকটা।

বিস্মিত আর কৌতূহলী পশুমানবরা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ভিতরে। হাঁটতে শুরু করলাম আমিও, যথাসম্ভব ধীরস্থির ভঙ্গিতে ওদেরকে পাশ কাটালাম। আমার পিছু নিল একজন, কিন্তু মন্টগোমারির সপাং করে চাবুক চালানোর শব্দ শুনে ছুটে পালাল আবার। বাকিরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদেরকে। ডক্টর মরোর কথা সত্য হলে একসময় জন্তুজানোয়ার ছিল ওরা; কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কী উপায় আবিষ্কার করলেন তিনি, যার ফলে আধা-মানুষ হয়ে গিয়ে মানুষেরই মতো চিন্তাভাবনা করতে, কথাবার্তা বলতে শুরু করল ওরা?

চোদ্দ

'এবার আপনার কৌতূহল নিবৃত্ত করা যাক,' বললেন মরো।

বসে আছি তাঁর বাড়িতে, নিজের ছোট্ট ঘরে। ডিনার সেরেছি কিছুক্ষণ আগে।

'তবে তার আগে আরেকটা কথা বলতেই হচ্ছে,' বলে চললেন তিনি। 'এর আগে আরও কয়েকজন অতিথি থেকে গেছে আমার বাড়িতে, কিন্তু আপনার মতো একগুঁয়ে ছিল না কেউই। কান খুলে শুনে রাখুন, আমার ঘাড়টাও বাঁকা, আপনার চেয়ে বেশিই হবে বোধহয়—এই শেষবারের মতো দয়া করলাম আপনাকে। পরের বার আপনি আত্মহত্যা করতে চাইলে যখন খুশি করবেন; নিজের কাজকর্ম ফেলে, মূল্যবান সময় অপচয় করে, সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে আপনাকে বাঁচাতে যাবো না আমি।'

আমার ডেকচেয়ারটা দখল করেছেন তিনি, ফর্সা আর কর্মপটু আঙুলে ধরে আছেন আধ-খাওয়া একটা সিগার। আমাদের মাথার উপর দুলছে জ্বলন্ত একটা লণ্ঠন, সেটার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে তাঁর সাদা চুল। আমাকে নরমকণ্ঠে হুমকিটা দিয়ে তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে বাইরে, তারার আলো দেখছেন বোধহয়। তাঁর থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে বসেছি, আমাদের মাঝখানে একটা টেবিল, আর আমার দু'হাতে দুটো রিভলভার। মন্টগোমারি নেই, ভিতরে কী যেন করছে। সে থাকুক বা না-থাকুক, ঘরটা ছোট হোক বা বড়, হাতে রিভলভার থাকলে আমি তো আমি, যে-কোনো পশুমানবও ওদের দু'জনের মোকাবেলা করতে পারবে নিশ্চয়ই।

আমার দিকে তাকালেন মরো। 'এখন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আপনার ভাষায় কাটাছেঁড়া করা ওই জন্তুটা আসলে পুমা, মানুষ না?'

বাড়িতে ফিরেই আমাকে ওই বিভীষিকার সামনে নিয়ে যান

মরো, প্রমাণ করে দেখান তিনি আসলেই "নর-ব্যবচ্ছেদ" করেন না।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'ওটা পুমাই। কিন্তু জ্যান্ত অথচ অজ্ঞান না-করা একটা পশুকে এভাবে কাটাকুটি করা...পুমাটা দেখামাত্র আমার কী মনে হয়েছিল জানেন? মনে হয়েছিল কসাই-এর দোকানে ছাল-ছাড়ানো জ্যান্ত মাংস ঝুলছে বুঝি। উফ্ বীভৎস...'

'যা দেখেছেন স্রেফ ভুলে যান,' নির্বিকার কণ্ঠে বললেন মরো। 'এসব...সস্তা আবেগের কোনো দাম নেই আমার কাছে। বয়স কম তো আপনার, তাই অল্পতেই ঘাবড়ে যান আসলে। প্রথম প্রথম যখন এখানে এল মন্টগোমারি, আপনার মতোই ছটফট করত। যা-হোক, আপনি মেনে নিয়েছেন, মারি কাটি বা যা-ই করি, নিজের টাকায় কেনা একটা পুমারই সর্বনাশ করছি আমি। ঠিক?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'তাহলে শারীরবৃত্তীয় কিছু বক্তৃতা দেবো এখন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বলেছিলেন জীববিজ্ঞানের ছাত্র আপনি, আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হবে না আশা করি।'

একঘেয়ে কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন তিনি, পরে আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগল কথায়। তাঁর গবেষণার অনেক কিছুই জানালেন আমাকে। সহজভাবে এমন ভঙ্গিতে বললেন যে, অতিরঞ্জিত মনে হলো না একটা বাক্যও। স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গোক্তিও করলেন মাঝেমধ্যে, লজ্জায় কান গরম হয়ে উঠল আমার।

আধা-জন্তু আধা-মানুষ যাদেরকে দেখছি দ্বীপে তারা কোনোকালেই মানুষ ছিল না আসলে। ছিল পশু; মানুষ বানানো হয়েছে ওদেরকে, বা বলা ভালো মানুষ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সে-হিসেবে ডক্টর মরোর এই কাজের আনুষ্ঠানিক নাম

হতে পারে এরকম– "প্রাণী-ব্যবচ্ছেদের বৈজ্ঞানিক সাফল্য"।

'দক্ষ একজন প্রাণী-ব্যবচ্ছেদকারী কী করতে পারে সেটা তো শুনলেনই,' বলছেন মরো, 'কিন্তু আমার কাছে কোন্ ব্যাপারটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে জানেন? এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে এত আয়োজন করে যা করছি আমি, সেটা আগে কেন করল না অন্য কেউ? কাজটা কিন্তু খুব জটিল কিছু না–নিশ্চয়ই জানেন মানুষের সঙ্গে চারপেয়ে স্তন্যপায়ী জন্তুর গঠনগত মিল আছে অনেক, মিলগুলো ঠিক রেখে অমিলগুলো কেটেছেঁটে বাদ দিতে পারলে একটা জন্তুকে মানুষ বানানো কি একেবারেই অসম্ভব? জিভের কথাই ধরুন না–জন্তুজানোয়ারের জিভ লম্বা হয় বেশি, অপারেশন করে সেটা ছোট করা যায়। আবার ড্যাবড্যাবা চোখও ছুরির কয়েকটা আঁচড়ে মানুষের মতো বানানো যায়। অপারেশনটাই আসল কাজ, সেটা শেষ হলে ছোটখাটো কয়েকটা পরিবর্তন বাকি থাকে; যেমন রঙ পাল্টানো, আবেগ শুধরানো, ফ্যাটি টিস্যুর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা–এসব আর কী।'

'কিন্তু কী লাভ হচ্ছে আসলে? জন্তুজানোয়ারকে মানুষ বানিয়ে...'

হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন মরো। 'আপনার প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার সময় আসেনি এখনও। গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছি আমি, আরও অনেক কাজ বাকি। আপনার ভাষায় যেসব আধা-পশু আধা-মানুষ দেখছেন দ্বীপে, ওরা আসলে কিছুই না, কিংবা বলতে পারেন আমার গবেষণার তুচ্ছ ফলাফল। আরও ভালো অস্ত্রোপচার করতে পারলে ফলও হতো ভালো, কিন্তু...' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'কথায় বলে: গবেষণার সঙ্গী তিনজন, গড়া ভাঙা পরিবর্তন। ...নাকের খুব সাধারণ একটা অপারেশনের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই? কপাল থেকে একটুকরো

চামড়া কেটে নিয়ে ভেঙেচুরে যাওয়া নাকে লাগিয়ে দেয় সার্জনরা। কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে গিয়ে চামড়া এমন হয় যে, অপারেশনের ব্যাপারটা ধরাই যায় না–গাছের কলম করার মতো। জীবজন্তুর শরীরেও এরকম কলম করা যায়। যেমন স্কটিশ অ্যানাটমিস্ট হান্টার গরুর ঘাড়ে কক-স্পার করেছেন, আবার কিছুদিন আগে নাকি আলজেরিয়ায় এই কলম প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়েই সাধারণ ইঁদুর থেকে বানানো হয়েছে দৈত্যাকৃতির ইঁদুর।'

'দৈত্যাকৃতির ইঁদুর! তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন...'

'হ্যাঁ। এই দ্বীপে আপনার কথামতো যেসব পশুমানব দেখছেন, তাদেরকে সত্যিই কেটেছেঁটে নতুন আকৃতিতে বানিয়েছি আমি। এটাই আমার সারাজীবনের গবেষণা– আকার-আকৃতি পাল্টে দিয়ে কীভাবে নতুন রূপ দেয়া যায় জীবন্ত প্রাণীকে। বছরের পর বছর পড়াশোনা করেছি এই বিষয়ে, বই পড়ে যতটা না শিখেছি তারচেয়ে বেশি শিখেছি হাতেকলমে কাজ করে। ...দেখে মনে হয় আমার কথা শুনে ভয় পাচ্ছেন আপনি, কিন্তু আমি যা বলছি তার কোনোকিছুই কিন্তু নতুন না। বিজ্ঞান, বলা ভালো ব্যবহারিক অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা অনেক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছে এ-ব্যাপারে, আর কাজটা হয়তো সবার আগে শুরু করেছি আমিই। একটা জানোয়ারের বাইরের কাঠামোটা হয়তো পাল্টাতে পারবো না; কিন্তু সেটার শারীরবৃত্ত, রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সবই পাল্টে দেয়া সম্ভব–শুধু জানতে হবে কখন কোন্ টিকাটা কোথায় দিতে হবে। জানেন বোধহয়, রক্ত সঞ্চালনের উপর মোটামুটি একইরকম একটা গবেষণা করেছিলাম আমি একসময়। যা-হোক, আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, একটা প্রাণীর শরীরের এক জায়গা থেকে টিস্যু সরিয়ে আরেক জায়গায় যেমন

বসিয়ে দেয়া যায়, ঠিক তেমনই এক জন্তুর শরীরের টিস্যুও আরেক জন্তুর শরীরে বসানো সম্ভব। কাজটা করতে পারলে দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়া পাল্টে যাবে, হাত-পায়ের গ্রন্থি অন্যরকম হবে, পশুর নিজস্ব অঙ্গসংস্থানও আগের মতো থাকবে না আর।'

'কিন্তু এই লোকগুলো কথা বলে কীভাবে?'

'এইখানেই আমার কৃতিত্ব। প্রাণী-ব্যবচ্ছেদে আমার হাত এত পেকে গেছে যে, আমি শুধু দেহকাঠামোই পাল্টাই না, পশুর মধ্যে মানুষের স্বভাব-চরিত্রও ঢুকিয়ে দেই। ইচ্ছা করলে একটা গোঁয়ার শুয়োরকেও অনেক কিছু শেখাতে পারে মানুষ। শুনলে আশ্চর্য হবেন হয়তো, একটা পশুর মানসিক গঠন কিন্তু সেটার শারীরিক গঠনের চেয়ে অনেক সরল। ভেবে দেখুন– শারীরিকভাবে যত কাজ করে একটা জানোয়ার, মানসিকভাবে কি তার দশভাগের একভাগ কাজও করে? হিপনোটিযমের নাম শুনেছেন না? কী করা হয় এই পদ্ধতিতে জানেন? সহজ করে বলি– সহজাত ধ্যানধারণা পাল্টে দিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা ঢুকিয়ে দেয়া হয় মনে, এখন যার মন যত সরল তার মনে তত শক্ত হয়ে গেঁথে যায় ওসব মন্ত্রণা। একধরনের নৈতিক শিক্ষা আর কী। হিংস্রতাকে পাল্টে দিয়ে আত্মত্যাগ বানাই আমি, যৌনতাকে বানাই ধার্মিক আবেগ। আর কথার ব্যাপারটা–মানুষ আর বানরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা কোথায় জানেন? বাগ্‌যন্ত্রে। অপারেশন করে একটু এদিক-ওদিক করে দিলে মানুষের মতো কথা বলতে অসুবিধা হয় না ওদের।'

'কিন্তু অসুবিধা তো হচ্ছে। আপনার পশুমানবরা...'

হাত নেড়ে অসভ্যের মতো আমাকে থামিয়ে দিলেন মরো।

প্রসঙ্গ পাল্টালাম, 'আচ্ছা, আপনি তো জন্তুগুলোকে অন্য

কোনো পশুর আকৃতি দিতে পারতেন। কিন্তু সবগুলোকে মানুষ বানানোর চেষ্টা করছেন কেন?'

'মনের খেয়াল। ইচ্ছা করলেই আমি ভেড়াকে লামা বা লামাকে ভেড়া বানাতে পারি। কিন্তু মানুষ বানানোর মধ্যে একটা কৃতিত্ব আছে, একটা শিল্প আছে—অন্য কোনো জন্তুর মধ্যে যা নেই। আর আমি যে শুধু মানুষই বানাচ্ছি এ-কথাটাও কিন্তু ঠিক না। দু'-একবার...' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, চুপ করে থাকলেন মিনিটখানেক। 'সময়! কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়! আরও অনেক অনেক সময় পেলে কত কিছুই না করতে পারতাম! সেসব তো হলোই না, বরং...' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন হঠাৎ, 'বরং আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে নষ্ট হলো পুরো একটা দিন, আবার এখন কাজকর্ম বাদ দিয়ে এখানে বসে একটা ঘণ্টা ধরে বকবক করতে হচ্ছে আপনার সঙ্গে।'

'কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম না এখনও। এই যে এত জন্তুজানোয়ার ধরে এনে ওগুলোকে সীমাহীন কষ্ট দিয়ে কাটাছেঁড়া করছেন, সব কি শুধু আপনার গবেষণার খাতিরে, নাকি বাস্তবে কোনো প্রয়োগ আছে ব্যাপারটার?'

'হুঁ,' রহস্যময় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মরো। 'এই ক'দিনে নিশ্চয়ই বুঝেছেন আমি অন্য জাতের মানুষ। আপনার চিন্তাভাবনা কথাবার্তার সঙ্গে আমার চিন্তাভাবনা কথাবার্তার অনেক পার্থক্য। আপনি বস্তুবাদী লোক।'

'আমি বস্তুবাদী না,' তীব্র প্রতিবাদ করলাম কথাটার।

আবারও হাত তুলে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি। 'অন্তত আমার দৃষ্টিতে। কয়েকটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত আমি— জন্তুজানোয়ার ধরে আনছি, কাটাছেঁড়া করছি; কিন্তু ওই যে বললেন সীমাহীন কষ্ট দিয়ে, এই কথাটা মানতে আপত্তি আছে

আমার। কাউকে কষ্ট পেতে দেখলে বা শুনলেই অসুস্থ হয়ে যান আপনি, কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন কষ্ট বা বেদনা জিনিসটা আসলে কী? জানি না আপনি কী করেন, তবে যা-ই করেন, লন্ডনে নিশ্চয়ই ফুটপাতে খোলা আকাশের নীচে ঘুমান না; বস্তি হোক, অ্যাপার্টমেন্ট হোক, প্রাসাদ হোক—কোনো-না-কোনো একটাতে থাকেন। আপনার সামান্য আরামের জন্য কতগুলো লোক যে সীমাহীন কষ্ট করছে ভেবেছেন কখনও? এ তো গেল শুধু থাকা; খাওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, কাপড়—এসব তো বাকিই আছে। আমি গবেষণার জন্য দু'চারটা জন্তুজানোয়ার কাটি এটা চোখে পড়ল, আর আপনারা, সুসভ্য লন্ডনবাসীরা, আরাম-আয়েশের জন্য কত হাজার হাজার মানুষকে কষ্ট দিয়ে জীবন্মৃত বানিয়ে রাখেন সেটা চোখে পড়ে না?'

এত বড় একটা সত্যকথা হজম করতে সময় লাগল। 'কিন্তু...কিন্তু...' কথা খুঁজে না-পেয়ে তোতলাতে লাগলাম, 'আপনি যা করছেন...সেটাও ঠিক না...'

'ঠিক-বেঠিক নিয়ে ভাবলে তো গবেষণা করা যাবে না। বিজ্ঞান নিয়ে আপনি যত পড়াশোনা করবেন, আপনার অনুশোচনাবোধও তত কমতে থাকবে। চোখ-কান বুজে কাজ করেছি আমি, কী করছি সেটা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। এ-কারণেই একে একে অনেকগুলো পশুমানব পয়দা হয়ে গিয়ে ঢুকেছে দূরের ওই গুহাগুলোতে। এগারো বছর হলো এখানে এসেছি আমরা। আমরা মানে আমি, মন্টগোমারি, আর ছ'জন ক্যানাকা। এখনও মাঝেমধ্যে মনে পড়ে, কীরকম শান্ত আর সবুজ ছিল এই দ্বীপ, কত ফাঁকা ছিল চারদিকের সাগর। অথচ ভাবলে মনে হয় এগারো বছর না, মাত্র গতকাল এসেছি যেন। এখনও যখন এখানে একা একা হেঁটে বেড়াই, মনে হয়

আমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল এই দ্বীপ।

'মালসামান নামালাম আমরা, এই বাড়িটা বানালাম। সরু উপত্যকার ধারে কয়েকটা গুহা খুঁজে পেয়ে সেখানেই থাকতে শুরু করল ক্যানাকারা। সঙ্গে করে নিয়ে আসা সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি দিয়েই কাজ শুরু করলাম আমি। বেখাপ্পা কিছু ঘটনা ঘটল প্রথম প্রথম। কাজ করছিলাম ভেড়া নিয়ে, কিন্তু কেটে ফেললাম ভুল জায়গা–দেড়দিনের মাথায় মারা গেল জন্তুটা। আরেকটা ভেড়া নিলাম, কাজ শেষে দেখি ভয়ানক একটা জিনিস হয়ে গেছে সেটা, তারপরও বেঁধে ফেলে রাখলাম ক্ষত শুকানোর জন্য। দেখতে যা-ই হোক, মানুষের আদল মোটামুটি পেয়েছিল ভেড়াটা। আবার যখন কাজে হাত দিলাম, আর ভালো লাগল না কেন যেন। বুদ্ধির দিক দিয়ে ভেড়ার মতোই রয়ে গিয়েছিল সেটা, তাই আমার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল হয়তো। যত দেখলাম জিনিসটাকে তত কদাকার মনে হলো, শেষপর্যন্ত মেরেই ফেললাম। বুঝলাম এসব ভেড়া-বকরি দিয়ে কাজ হবে না, আমার চাই হিংস্র কিছু–নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে এমন কিছু।

'একটা গরিলা ছিল আমার কাছে, নিলাম ওটাকে। অনেক কষ্ট করে, সীমাহীন যত্ন নিয়ে আমার প্রথম মানুষ বানালাম। পুরো একটা সপ্তাহ, দিনরাত খাটলাম ওটার পেছনে। মস্তিষ্কটা বানানোই ছিল আসল কাজ–অনেক কিছু ঢুকিয়েছি, অনেক কিছু পাল্টেছি। বানানোর পর দেখতে অনেকটা নিগ্রোদের মতো হলো জিনিসটা। ব্যান্ডেজে মোড়া আর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমার সামনে পড়ে ছিল, নড়ছিল না একটুও। যখন বুঝলাম বেঁচে আছে, চলে এলাম এই ঘরে। এসে দেখি আপনার মতো অবস্থা হয়েছে মন্টগোমারির–"মানুষ" হওয়ার সময় আর্তনাদ করছিল গরিলাটা, শুনে সহ্য করতে পারেনি বেচারা। যা-হোক, প্রথম

প্রথম ভরসা করতে পারিনি জন্তুটার উপর। কানাকারাও বোধহয় বুঝতে পারে ব্যাপারটা। আমাকে দেখলেই খুব ঘাবড়ে যেত ওরা। ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না-পারে সেজন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে আর মন্টগোমারিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি—ওদেরকেও হারিয়েছি, ইয়টটাও গেছে। অবশ্য এর আগেই গরিলাটাকে শেখাতে শুরু করি আমি, তিন-চার মাস খাটি একটানা। কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শেখালাম ওটাকে, কীভাবে গুনতে হয় দেখালাম, এমনকী বর্ণমালা পর্যন্ত পড়তে শেখালাম। আস্তে আস্তে একটু একটু করে শিখতে লাগল জন্তুটা, কিন্তু এমন মানুষও দেখেছি আমি যারা ওই গরিলাটার চেয়েও নির্বোধ—সামান্য ওই বিদ্যাটুকু শিখতে যাদের আরও বেশি সময় লেগেছে। একেবারে টাটকা মন নিয়ে কাজ শুরু করল সেটা, আগের কোনো স্মৃতিই ছিল না আর। সেটার ক্ষতগুলোও শুকিয়ে গেল পুরোপুরি, ততদিনে একটু একটু কথাও বলতে শিখেছে জন্তুটা। একদিন ওকে নিয়ে গেলাম কানাকাদের কাছে।

'যে-কোনো কারণেই হোক খুব ভয় পেয়ে গেল ওরা। ব্যাপারটা খারাপ লাগল আমার কাছে, কারণ গরিলাটাকে নিয়ে গর্ব ছিল আমার। যা-হোক, পরে যখন কানাকারা দেখল জন্তুটা আসলেই নিরীহ, খাতির-যত্ন শুরু করল সেটার, এটা-সেটা শেখাতে লাগল। এবার আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি শিখতে লাগল গরিলাটা, কানাকাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল। এমনকী ওদের ঝুপড়ির চেয়ে ভালো একটা কুঁড়েঘরও বানিয়ে নিল নিজের জন্য। কানাকাদের মধ্যে একটা ছেলে ছিল মিশনারির, গরিলাটাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিল সে—অক্ষর চিনতে শিখল জন্তুটা, নীতিজ্ঞানও শিখল কিছু।

'কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিলাম আমি, পুরো ঘটনাটা লিখে

পাঠিয়ে ইংরেজ ফিযিওলজিস্টদের একহাত নেয়া যায় কি না ভাবছিলাম। কিন্তু একদিন দেখি দুই কানাকা ক্ষেপাচ্ছে গরিলাটাকে, আর একটা গাছের উপর উবু হয়ে বসে কিচিরমিচির করে কী যেন বলছে জন্তুটা। শাসালাম ওকে, ওরকম আচরণ মানুষকে মানায় না বলে লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করলাম, তারপর ফিরে এলাম বাসায়। ঠিক করলাম ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার আগে আরও ঘষামাজা করতে হবে গরিলাটাকে। ভালোই এগোচ্ছিল আমার কাজ। তারপরও কীভাবে যেন বারবার পশু-প্রবৃত্তি জেগে উঠছিল সেটার ভিতরে। কিন্তু হাল ছাড়িনি আমি, সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা করছি এখনও।

'যে ক'জন কানাকাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, মারা গেছে তাদের সবাই। লঞ্চ থেকে পড়েছে একজন, আরেকজনের গোড়ালিতে লেগেছিল বিষাক্ত গাছের রস—বিষক্রিয়ায় মরেছে বেচারা। ইয়টটা নিয়ে পালিয়ে যায় তিনজন, পরে ডুবে মরেছে বোধহয়। আরেকজনকে...কী বলব...হত্যা করা হয়েছে।'

'হত্যা করা হয়েছে মানে?' ধরলাম কথাটা।

'আমার বানানো একটা পশুমানব...' ইতস্তত করলেন মরো কিছুক্ষণ, 'হত্যা করে ওই কানাকাকে। শুধু ওই লোকটাকেই না, যেটাকেই ধরেছে খুন করেছে। দু'দিন ধরে তাড়া করার পর জন্তুটাকে মেরে ফেলি আমরা। আসলে আমার কাজ শেষ হয়নি তখনও, একটা ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখছিলাম। তাই ছাড়া পাওয়ার কথা ছিল না জিনিসটার—দুর্ঘটনাক্রমে পালিয়ে যায়। হাত-পা ছিল না, চেহারা ছিল ভয়ঙ্কর: শরীরটা সাপের মতো মুচড়ে মুচড়ে মাটির উপর ঘষটাতে ঘষটাতে পালায় জন্তুটা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ছিল সেটার, ব্যথা আর রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল প্রায়। আমরা ধাওয়া করার আগে শিকারের আশায় ওত পেতে

থাকত জঙ্গলের ভিতরে, তাড়া খেয়ে দ্বীপের উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাই আমরা, তারপর দু'দিক থেকে চড়াও হই জন্তুটার উপর। প্রথমে রাজি হইনি মন্টগোমারিকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু চাপাচাপি করতে থাকে সে। যে-কানাকাটাকে খুন করে জন্তুটা, তার সঙ্গে একটা রাইফেল ছিল। লোকটার লাশ যখন পেলাম, দেখি "এস"-এর মতো বেঁকে আছে নলদুটো—কামড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে প্রায়। গুলি করে জন্তুটাকে মারল মন্টগোমারি। এরপর থেকে মানুষের সঙ্গে আকৃতিতে মেলে এমন জন্তুজানোয়ার নিয়ে কাজ করছি শুধু।'

থামলেন মরো। তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম আমিও।

'ইংল্যান্ডের নয় বছরসহ ধরলে মোট বিশ বছর ধরে এই কাজ করছি আমি,' কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করলেন মরো আবার, 'কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি এখনও। কিছু-না-কিছু বাকি থেকেই যায় প্রতিবার, একটা পশুমানব বানানোর পর আরও ভালো আরেকটা বানানোর চ্যালেঞ্জ অনুভব করি ভেতরে ভেতরে। আমার ক্ষমতার চেয়েও বেশি কিছু করে ফেলি কখনও কখনও, আবার কখনও একেবারেই সাদামাটা হয় আমার কাজ—কিন্তু যত যা-ই করি অপূর্ণই থেকে যায় আমার স্বপ্ন। চারপেয়ে জন্তুকে মানুষের আকৃতি দেয়া এখন আমার জন্য ছেলেখেলা। তবে হাত আর থাবা নিয়ে কাজ করার সময় সমস্যা হয় কিছুটা—ভয় হয় বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বিকৃত না করে ফেলি। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা কোথায় জানেন? ইতর প্রাণীর মস্তিষ্ককে মানুষের মস্তিষ্কের মতো বানানো। বুদ্ধি একেবারেই কম ওদের, আবেগও কেমন খাপছাড়া। তবে সব সমস্যার সমাধান করবোই আমি একদিন। যতবার কোনো জন্তুকে নিয়ে কাজ শুরু করি, মনে মনে

বলি, "এবার সব পশুত্ব বের করে আনবো এটার ভেতর থেকে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটা মানুষ বানাবো নিজের মতো করে! কত হাজার বছর ধরে এটা-সেটা বানাচ্ছে মানুষ, সে-তুলনায় আমার বিশ বছর আর এমন কী?" কাজ শেষ হওয়ার পর কিছুদিন সব ঠিক থাকে, তারপর কীভাবে যেন পশুত্ব ভর করে ওগুলোর উপর আবার।"

'তাহলে মানুষ বানানোর পর ওদেরকে নিয়ে গিয়ে ওই গুহাগুলোয় ছেড়ে দিয়ে আসেন আপনি?'

'ওরাই যায়। যখন দেখি ওদের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে, বের করে দেই ওদেরকে। ইদানীং ওই গুহাগুলোর ভেতরে আস্তানা গেড়েছে ওরা। আমাকে আর এই বাড়িটাকে ভীষণ ভয় পায়। জানেন হয়তো—মনুষ্যত্বের কিছুটা চর্চা আছে ওদের মধ্যে। মন্টগোমারি জানে ব্যাপারটা, কারণ ওদের কাজেকর্মে নাক গলাতে হয় ওকে। দু'-একজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে সে, প্রয়োজনে কাজে লাগায়। বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—ওদেরকে দিয়ে কাজ করাতে লজ্জা লাগে ওর, আবার একটু-আধটু পছন্দও করে বোধহয় কাউকে কাউকে। এটা ওর ব্যাপার, আমার কিছু করার নেই। ওদেরকে দেখলেই খারাপ লাগে আমার, নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে যায়। ওদের ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই আমার আসলে। মনে হয় মিশনারির ওই ছেলেটা ওদেরকে যা শিখিয়েছি-পড়িয়েছে, ওগুলোই ওরা মেনে চলে। আবার নামও দিয়েছে নিজেদের নিয়মের—আইন। স্তুতিগান গায় ওরা, থাকার জায়গা করে নেয় গুহার ভেতরে, ফলমূল আর লতাপাতা যোগাড় করে খাওয়ার জন্য, এমনকী বিয়ে পর্যন্ত করে। কিন্তু কোনো লাভ নেই আসলে—আগে যেমন পশু ছিল, এখনও সেরকম পশুই রয়ে গেছে ওরা, পার্থক্য বলতে আচার-ব্যবহারে

একটু পাল্টেছে। ওপরে ওঠার চেষ্টা আছে কারও কারও মধ্যে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে অন্তঃসারশূন্যতা, যৌন আবেগ আর কৌতূহলের অপচয়। সত্য বললে—ওদের কাজ দেখে হাসি পায় আমার নিজেরই। তবে এই পুমাটাকে নিয়ে কিছুটা আশা আছে আমার। মাথা আর মস্তিষ্কের উপর বেশি জোর দিয়েছি এবার...'

কথা শেষ না-করেই থেমে গেলেন মরো, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সব কথাই তো বললাম, এবার বলুন কী মনে হয় আপনার। এখনও ভয় পাচ্ছেন আমাকে?'

স্থিরদৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে। সাদা চেহারা আর সাদা চুলের একটা মানুষ, দু'চোখ শান্ত। চমৎকার স্বাস্থ্য, সৌম্য একটা ভাব যেন ফুটে বের হচ্ছে শরীর থেকে। তাঁর সমান বয়সের একশ' জন বৃদ্ধকে একজায়গায় জড়ো করলে সৌন্দর্যে বা স্বাস্থ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন তিনি হয়তো। কিন্তু তারপরও কেন যেন কেঁপে উঠলাম আমি। তাঁর প্রশ্নের জবাবে রিভলভার দুটো বাড়িয়ে ধরলাম তাঁর দিকে।

'রেখে দিন আপনার কাছেই,' বলে হাই তুললেন মরো, আমার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাসলেন। 'ঘটনাবহুল দুটো দিন কাটল আপনার। এবার ভালোমতো ঘুমান। সবকিছু পরিষ্কার হয়েছে আপনার কাছে, এতেই খুশি আমি। গুড নাইট,' কী যেন ভাবলেন তিনি এক মুহূর্ত, তারপর ভিতরের দিকের দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিকের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম আমি। ফিরে এসে বসে পড়লাম আবার, স্থির হয়ে বসেই থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। শারীরিক-মানসিকভাবে এত ক্লান্ত লাগছে যে, ডক্টর মরো যা বলে গেছেন তার বাইরে কিছু ভাবতে পারছি

না। কালো জানালাটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে জ্যান্ত একটা চোখের মতো। একটু কসরত করেই নেভাতে হলো লণ্ঠনটা, তারপর গিয়ে উঠলাম আমার দোলনা-বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগল না একটুও।

পনেরো

ঘুম থেকে উঠে পড়লাম সকাল সকাল। মরোর কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মনের ভিতরে, ঘুম ভাঙার পর থেকেই। নামলাম আমার দোলনা-বিছানা থেকে, গিয়ে দেখে এলাম ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না বাইরের দিকের দরজাটা। জানালার শিকগুলো দেখলাম এরপর—না, ভাঙার চেষ্টা করেনি কেউ।

দরজায় টোকা পড়ল এমন সময়। শুনলাম জড়ানো উচ্চারণে কী যেন বলছে ম্লিং। একটা রিভলভার ঢুকালাম পকেটে (হাত বের না-করে ধরে রাখলাম অস্ত্রটা), তারপর খুলে দিলাম দরজা।

'গুড মর্নিং, সেআর,' বলল ম্লিং। দ্বীপের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী শাকসব্জির নাস্তা নিয়ে এসেছে সে, সঙ্গে খরগোসের মাংসও আছে; তবে দেখেই বুঝতে পারছি মাংসের রান্নাটা ভালো হয়নি। ওর পিছন পিছন ঢুকল মন্টগোমারি। চঞ্চলদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে, আমার একটা হাত যে পকেটে ঢুকানো সেটা দেখতে সময় লাগল না ওর। বাঁকা হাসল সে।

পুমাটাকে কাটাছেঁড়া করা শেষ মরোর, ক্ষত শুকানোর জন্য

ফেলে রেখেছেন—মানে তেমন কোনো কাজ নেই তাঁর; কিন্তু তারপরও আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলেন না তিনি। মানুষটা আসলে একা থাকতেই পছন্দ করেন। পশুমানবদের জীবনাচরণ সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা পাওয়ার জন্য এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম মন্টগোমারিকে। আসলে জানতে চাইছি অন্য একটা ব্যাপার—মরো আর মন্টগোমারির উপর হামলা করছে না কেন ওরা এখনও, নিজেদের মধ্যেই বা মারামারি-কাটাকাটি করা থেকে বিরত আছে কেন। মন্টগোমারি বলল, পশুমানবদের চিন্তাভাবনা নাকি সীমিত পর্যায়েই রয়ে গেছে এখনও। বুদ্ধিমত্তা বাড়ানো হয়েছে ওদের, তারপরও পশুপ্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে যে-কোনো সময়; ওদের মনে নির্দিষ্ট কিছু ধ্যানধারণা ভরে দিয়েছেন মরো, কিন্তু এর ফলে বিকশিত না-হয়ে সীমিত হয়ে গেছে ওদের কল্পনাশক্তি। হিপনোটিযমের মাধ্যমে ওদেরকে শেখানো হয়েছে কী কী কাজ করা যাবে না, সুবোধ বালকের মতো সব মেনে নিয়েছে ওরাও।

"আইন" নামের যেসব নিয়ম মানে ওরা, সেটা আসলে না-মানার সমান—কারণ এর ফলে ওদের দুর্দমনীয় পশুপ্রবৃত্তি তিরোহিত হয়নি। হয়তো প্রতিদিনই ওই "আইন" আবৃত্তি করে ওরা, আবার প্রতিদিনই ভাঙে। ওরা যেন রক্তের স্বাদ না-নেয় সেজন্য চিন্তার শেষ নেই মরো আর মন্টগোমারির; কিন্তু মন্টগোমারি নিজেই বলল, বিড়ালজাতীয় প্রাণী থেকে যে-পশুমানবদের বানানো হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নাকি রাতের বেলায় দুর্বল হয়ে যায় ওই "আইন"। মানে রক্তের স্বাদ না-নিলেও ওদের ভিতরের পশুটা জেগে ওঠে—দিনের বেলায় যে-দুঃসাহসিক কাজ কল্পনাও করতে পারে না, সেটা করে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে রাতে। মনে পড়ে গেল চিতাবাঘ-মানবের কথা, যেদিন

এসেছিলাম এই দ্বীপে সে-রাতেই আমাকে ধাওয়া করেছিল জন্তুটা।

এরপর কী হলো বলার আগে এই দ্বীপ আর দ্বীপবাসীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া দরকার। এ-ক'দিন এখানে-সেখানে ছোটাছুটি করে জানতে পেরেছি অনেক কিছু। দ্বীপটা বিষম আকৃতির, সমুদ্র সমতল থেকে খুব বেশি উঁচু নয়। আয়তনে সাত কি আট বর্গমাইলের মতো হবে। উৎপত্তিগত দিক দিয়ে আগ্নেয়, তিন দিকে প্রবালপাহাড়ের বিস্তার। উত্তরপ্রান্তের মাটিতে কিছু ফাটল আছে, ধোঁয়া বের হয় সেগুলো দিয়ে মাঝেমধ্যে। একটা উষ্ণ-প্রস্রবণও আছে সেদিকে। কখনও কখনও অনুভূত হয় মৃদু ভূমিকম্প, কখনও আবার চূড়ার মতো মোচাকার ধোঁয়া ভেঙে যায় বাষ্পের আকস্মিক উদ্গারে।

ছোট ছোট কিম্ভূত জন্তুগুলোকে বাদ দিয়ে মরোর বানানো পশুমানবদের সংখ্যা ষাটের মতো হবে। সব মিলিয়ে একশ' বিশটার মতো পশুমানব বানিয়েছেন তিনি এ-পর্যন্ত, অর্ধেকের মতো মারা গেছে, কোনো কোনোটাকে হত্যা করতে হয়েছে। বাচ্চা জন্ম দেয় "পশুমানবীরা", কিন্তু বেশিরভাগ বাচ্চাই বাঁচে না। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এসে "মানুষ" বানানোর চেষ্টা করেন মরো, কারণ মানুষের মতো আকৃতি বা আচরণ কোনোটাই পায় না ওরা বাবা-মা'র কাছ থেকে। পশুমানবদের চেয়ে সংখ্যায় কম পশুমানবীরা, "আইন" অনুযায়ী এক বিবাহের নিয়ম চালু থাকলেও অনেক পশুমানবের গোপন কাম-যন্ত্রণার জন্য দায়ী ওরাই।

শরীরের দৈর্ঘ্য আর পায়ের অসামঞ্জস্যই পশুমানবদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি বোধহয়। তবে দেখতে দেখতে সয়ে গেল ব্যাপারটা, এমনকী একসময় নিজের লম্বা উরুদুটোই বেঢপ

লাগতে শুরু করল আমার কাছে। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করলাম—হাঁটা বা বসার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে ওদের মাথা। মেরুদণ্ডটাও কেমন যেন বাঁকা, ঠিক মেলে না মানুষের মেরুদণ্ডের সঙ্গে। এমনকী বানর-মানবেরও একই সমস্যা। ওদের বেশিরভাগেরই কাঁধ বিশ্রীরকম উঁচু, প্রথম দেখায় কুঁজো বলে মনে হয়। খাটো খাটো হাত সবার, দুর্বলভঙ্গিতে ঝোলে শরীরের দু'পাশে। কারও কারও শরীরে আবার বড় বড় লোম।

আকৃতিগত দিক দিয়ে মোটামুটি সবাইকে কমবেশি প্রোগনেইথাস বলা যায়। বিকৃত কান সবার, নাক বড় আর স্ফীত, চুল ছোট ছোট আর খাড়া খাড়া। কারও চোখ অদ্ভুত রঙের, কারও চোখ আবার অদ্ভুতভাবে স্থাপিত। বকবক করার সময় বোকার মতো দাঁত দেখায় বানর-মানব, এছাড়া কারও মুখে হাসি দেখিনি কখনও। প্রত্যেকের মাথা নিজ নিজ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বহন করে; মানুষের আকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও চেনা যায় কে চিতাবাঘ, ষাঁড় বা শুয়োর ছিল আগে। একেকজনের কণ্ঠও একেকরকম। খুব কম সংখ্যকেরই হাতে দশটা আঙুল আছে, আর প্রায় সবার হাতেই আছে সংবেদনশীলতাহীন বিশ্রী নখ।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুই পশুমানব হচ্ছে আমাকে-ধাওয়া-করা চিতাবাঘ-মানব আর হাইনা-শুয়োর মিলিয়ে বানানো একটা জন্তু। দ্বীপে আসার সময় নৌকায় দেখেছিলাম যে তিনজনকে, ওরা আকারে ওই দু'জনের চেয়েও বড়, ষাঁড় থেকে বানানো। এরপর আছে রূপালী লোমের "আইন-পাঠক", ম্লিং এবং বানর আর ছাগল থেকে বানানো আধা-মানুষ আধা-পশুর মতো দেখতে একটা জন্তু। তিনটা শূকর-মানব আর একটা শূকর-মানবীও আছে, আরও আছে মাদি ঘোড়া আর গণ্ডার থেকে বানানো একটা জন্তু এবং অন্যান্য কিছু মাদি জন্তু যেগুলো কীভাবে বানিয়েছেন

মরো জানি না। নেকড়ের মতো কিছু জন্তু, ভালুক-ষাঁড়ের একটা "সংকর", সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর থেকে বানানো একটা "মানুষ"ও দেখেছি। আর বানর-মানবের কথা তো বলেছি আগেই। শিয়াল আর ভালুক থেকে বানানো ঘৃণ্য একটা মাদি জন্তুও আছে; ওটার বয়স যেমন প্রচুর, গায়েও তেমন বদ গন্ধ। শুনেছি পশুমানবদের জন্য যে-আইন প্রচলিত, এই মাদিটা নাকি সেই আইনের একনিষ্ঠ "উপাসক"। হরেক রঙের চিত্র-বিচিত্র ছোট ছোট কিছু জন্তুও আছে, শ্লথ-মানব ওদের অন্তর্ভুক্ত।

এদেরকে দেখলেই খুব ভয় লাগত প্রথম প্রথম। মনে হতো এখনও পশুই রয়ে গেছে ওরা। আস্তে আস্তে কিছুটা ধাতস্থ হলাম। তাছাড়া ওদের প্রতি মন্টগোমারির মনোভাব দেখেও কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। সে এত লম্বা একটা সময় ধরে ওদের সঙ্গে আছে যে, ওদেরকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু বলে মনেই করে না বোধহয়। মাঝেমধ্যে মনে হয় আমার, লন্ডনের কথা হয়তো ভুলেই গেছে সে। মরোর এজেন্ট, মানে জনৈক পশু-ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেন করার জন্য বছরে এক কি দু'বার আফ্রিকায় যায় সে। একবার আমাকে বলল, জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার করতে করতে নাকি "আসল" মানুষ দেখলে অস্বাভাবিক লাগে ওর কাছে; পশুমানবদের দেখার পর যেমনটা লেগেছিল আমার কাছে। কারণটা কী জিজ্ঞেস করায় বলল, মানুষের পা দুটো নাকি কেমন লম্বা লম্বা, মুখ চ্যাপ্টা, কপাল উন্নত—পশুদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না; তাছাড়া বেশিরভাগ লোকই নাকি সন্দেহপ্রবণ, বিপজ্জনক আর ওদের মনে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। এসব কারণে মানুষদের একেবারেই পছন্দ করে না সে। তবে আমার দুরাবস্থা দেখে করুণা হয়েছিল ওর, তাই আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। এসব "রূপান্তরিত" জন্তুর প্রতি ওর গোপন একটা

দরদ আছে মনে হয়, তবে ব্যাপারটা প্রথমে লুকানোর চেষ্টা করেছিল সে আমার কাছ থেকে।

স্লিং, মন্টগোমারির চাকর, আমার দেখা প্রথম পশুমানব, অন্যদের সঙ্গে থাকে না। মরোর এই গবেষণাগারের সীমানার বাইরে, ছোট্ট একটা ঘরে থাকে সে। বুদ্ধির দিক দিয়ে বানর-মানবের প্রায় সমান সে, তবে কথা শোনে অনেক বেশি। অন্য সব পশুমানবদের চেয়ে ওর আদলটাই মানুষের সঙ্গে মেলে বেশি। ওকে রান্না করা শিখিয়েছে মন্টগোমারি, গৃহস্থালির টুকটাক কাজ করতেও শিখিয়েছে। মরোর জটিল এক সৃষ্টি এই স্লিং—প্রথমে ছিল একটা ভালুক, কাটাছেঁড়ার সময় কুকুর আর ষাঁড়ের "মিশ্রণে" বর্তমান আকৃতিটা পেয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় অনেক সময় আর যত্ন নিয়ে ওকে বানিয়েছেন মরো। মন্টগোমারিকে খুব মানে সে। কখনও ওর পিঠ চাপড়ে দেয় মন্টগোমারি, আবার কখনও ঠাট্টা-তামাসা করে ওর সঙ্গে, কখনও আবার অদ্ভুত অদ্ভুত সব নামে ডাকে। মনিবের কাছ থেকে এ-ধরনের ব্যবহার পেয়ে যার-পর-নাই খুশি হয় স্লিং। আবার যখন গলা পর্যন্ত হুইস্কি গেলার পর হুঁশ হারিয়ে ফেলে মন্টগোমারি, তখন যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে ওর সঙ্গে—কখনও লাথি মারে, কখনও ধরে পেটায়, আবার কখনও ওর দিকে ছুঁড়ে মারে পাথর বা জ্বলন্ত দেয়াশলাই। কিন্তু যে-ধরনের ব্যবহারই পাক না কেন, মন্টগোমারিকে খুব ভালোবাসে স্লিং; মন্টগোমারির সঙ্গে থাকতে পারলে আর কিছু চায় না।

ষোলো

একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করার পর আমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো মন্টগোমারি। উদ্দেশ্য, দ্বীপের উত্তরদিকে যাবো, মাটির যেসব ফাটল দিয়ে ধোঁয়া বের হয় সেগুলো দেখবো। গরম পানির ঝরনাটার উৎস দেখার ইচ্ছেও আছে।

আমাদের দু'জনের সঙ্গেই আছে চাবুক আর গুলিভরা রিভলভার। পাতায় ছাওয়া একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা খরগোসের আর্তচিৎকার। থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলাম না। এগিয়ে চললাম। একসময় ভুলে গেলাম ব্যাপারটা।

লম্বা পা-ওয়ালা একজাতের গোলাপি প্রাণী দেখাল আমাকে মন্টগোমারি। ঝোপঝাড়ের ভিতর লাফালাফি করছে ওগুলো। মন্টগোমারি বলল, পশুমানবরা যেসব বাচ্চার জন্ম দেয়, সেসব থেকে এগুলো বানিয়েছেন ডক্টর মরো। ভবিষ্যতে মাংসের প্রয়োজন হলে এদের কাজে লাগানোর ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু এই প্রাণীগুলো নাকি নিজেদের বাচ্চাদের মেরে খেয়ে ফেলে, তাই ইচ্ছেটা বাদ দিতে হয়েছে তাঁকে। আগেও দেখেছি আমি এই প্রাণীগুলোকে—যে-রাতে চিতাবাঘ-মানবের ধাওয়া খেলাম সে-রাতে একবার, আরেকবার মরোর ধাওয়া খাওয়ার সময়।

হঠাৎ করেই আমাদের সামনে পড়ে গেল সেরকম একটা প্রাণী। আমাদের দেখে লাফিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল প্রাণীটা। কিন্তু কপাল খারাপ ওটার–ঝড়ের কারণে শিকড়সহ উপড়ে পড়েছিল একটা গাছ, গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়েছিল সে-জায়গায়, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওই গর্তে গিয়ে পড়ল ওটা; বের হয়ে আসার আগেই গিয়ে ধরলাম ওটাকে। ধরা-পড়া বিড়ালের মতো পা ছুঁড়তে লাগল প্রাণীটা, পিছনের পা দিয়ে আঁচড়ে দেয়ার চেষ্টা করল, কামড় বসাল একবার। কিন্তু ওটার দাঁতগুলো এত দুর্বল যে, মনে হলো সামান্য চিমটি কেটেছে কেউ।

চলতি পথে আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল–ফালি ফালি করে চিরে ফেলেছে কেউ একটা গাছের কাণ্ডের বাকল। আমাকে ডেকে ব্যাপারটা দেখিয়ে মন্টগোমারি বলল, 'আঁচড়ে গাছের ছাল তোলা যাবে না–এটাই আইন। কিন্তু ওরা দেখি খুব একটা পরোয়া করে না আইনটার!'

এগিয়ে চললাম আমরা। বানর আর ছাগল থেকে বানানো আধা-মানুষ আধা-পশুর মতো দেখতে জন্তুটা আর বানর-মানবের সঙ্গে দেখা হলো কিছুক্ষণ পর। মটরশুঁটির মতো কিছু একটা হাতে নিয়ে একনাগাড়ে কামড়াচ্ছে প্রথম জন্তুটা।

মন্টগোমারিকে দেখে "স্যালুট" করে বলল বানর-মানব, 'চাবুকওয়ালা দ্বিতীয় প্রভু দীর্ঘজীবী হোন!'

'চাবুকওয়ালা আরও একজন আছেন এখন,' বলল মন্টগোমারি, 'কথাটা মনে রেখো।'

'তাঁকে কি বানানো হয়নি?' জিজ্ঞেস করল বানর-মানব, 'তিনি বলেছিলেন, তাঁকে বানানো হয়েছে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল অন্য জন্তুটা।

'চাবুকওয়ালা তিন নম্বর প্রভুকে তো দেখি কাঁদতে কাঁদতে সমুদ্রের দিকে যায়। আর তাঁর মুখটাও যেমন সরু তেমন সাদা।'

'তাঁর হাতের চাবুকটাও যেমন সরু তেমন লম্বা,' বলল মন্টগোমারি।

অন্য জন্তুটা বলল, 'গতকাল দেখলাম তাঁর শরীর থেকে রক্ত পড়ছে আর তিনি কাঁদছেন। আমাদের শরীর থেকে কখনও রক্তও পড়ে না, আর আমরা কখনও কাঁদিও না। আমাদের আসল প্রভুর শরীর থেকেও রক্ত পড়ে না, তাঁকে কখনও কাঁদতেও দেখিনি।'

'বেশি কথা বলিস না,' রেগে গেল মন্টগোমারি, 'নইলে তোর শরীর থেকেও রক্ত পড়তে শুরু করবে। তখন কান্না কাকে বলে বুঝবি!'

বানর-মানব মুখ খুলল এবার, 'তিন নম্বর প্রভুর হাতে দেখি পাঁচটা করে আঙুল! তিনি আসলে আমার মতো পাঁচ-আঙুলের মানুষ!'

'চলে আসুন, প্রেনডিক,' আমার হাত ধরে টানল মন্টগোমারি। হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

বানর-মানব আর অন্য জন্তুটা দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়, বকবক করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

ফেরার সময় দেখি, একটা খরগোস মরে পড়ে আছে মাটিতে। কে বা কারা যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে হতভাগা জন্তুটার লাল শরীর, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাঁজরের সাদা হাড়, মেরুদণ্ডেও যে কামড় বসানো হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেখামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে গেল মন্টগোমারি। অস্ফুটস্বরে একবারমাত্র 'খোদা!' বলেই ঝুঁকে পড়ল খরগোসটার উপর। ভালোমতো দেখার জন্য হাতে তুলে নিল কয়েকটা ভাঙা

কশেরুকা। 'খোদা!' আবারও বলল সে, 'এর মানে কী?'

'আপনাদের কোনো মাংসাশী প্রাণীর বোধহয় মনে পড়ে গেছে আগের অভ্যাসের কথা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম।

একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে মন্টগোমারি। মুখটা সাদা হয়ে গেছে ওর, বেঁকে গেছে ঠোঁটজোড়া। 'ভালো লাগছে না আমার,' আস্তে আস্তে বলল সে।

'এরকম একটা ব্যাপার আগেও দেখেছি আমি। যেদিন দ্বীপে এলাম সেদিন।'

'কী?'

'আরেকটা মরা খরগোস। কেউ মুচড়ে ভেঙে ফেলেছিল ওটার মাথা।'

'কবে? যেদিন আপনি দ্বীপে এসেছিলেন সেদিন?'

'হ্যাঁ। বাড়ির দেয়ালের বাইরে যেসব ঝোপঝাড় আছে, ওখানে। সন্ধ্যায় যখন বাইরে গিয়েছিলাম তখন। পুরো মুচড়ে ফেলা হয়েছিল খরগোসটার মাথা।'

নিচু, লম্বা একটা শিস বাজাল মন্টগোমারি।

'আরেকটা কথা। আপনাদের একটা...কী বলি...জন্তুকে ঝরনার পানিতে মুখ ডুবিয়ে পানি খেতেও দেখেছি।'

'মুখ ডুবিয়ে পানি খেয়েছে?'

'হ্যাঁ। শুধু তা-ই না, ওই জন্তুটাই আমাকে তাড়া করেছিল।'

'মাংসাশী প্রাণীদের নিয়মই এরকম। শিকার করার পর পানি খায় ওরা। আচ্ছা, ওই জন্তটা দেখতে কীরকম ছিল? আবার দেখলে চিনতে পারবেন?' বলতে বলতে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল মন্টগোমারি, এদিক-ওদিক তাকাল। চারপাশের গাছগুলো আর ছায়া-ছায়া অন্ধকারের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি, বোধহয় খুঁজছে কেউ কোথাও ওত পেতে আছে কি না। একটু পর বলল,

'রক্তের স্বাদ।'

'হ্যাঁ, আবার দেখলে মনে হয় চিনতে পারবো ওটাকে,' বললাম আমি। 'খুব জোরে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম ওটার মাথায়, কপালে কালশিটা থাকার কথা।'

'কিন্তু তারপর আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ওই জন্তুটাই এই খরগোসটাকে খুন করেছে। ইস্স্! যদি ওই জন্তুগুলোকে কোনোদিনও এই দ্বীপে না-আনতাম!'

মৃত খরগোসটার দিকে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থেকে মনে মনে বোধহয় আফসোস করতে লাগল মন্টগোমারি। ওকে বিরক্ত না-করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর হাঁটার পর একজায়গায় দেখি, লুকিয়ে রাখা হয়েছে খরগোসটার অভুক্ত দেহাবশেষ।

ডাকলাম মন্টগোমারিকে, 'এদিকে আসুন!'

এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল সে যে, দেখে মনে হলো যেন এইমাত্র জেগেছে ঘুম থেকে। কিছুক্ষণ পর আমার কাছে এগিয়ে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'পশুমানবদের তো এই কাজ করার কথা নয়। ওদেরকে শেখানো হয়েছিল যেন কোনো প্রাণী মেরে না-খায়। দুর্ঘটনাক্রমে কেউ যদি রক্তের স্বাদ নিয়েও থাকে...'

থেমে গেল সে, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাঁটলাম আমরা। একসময় আপনমনে বলে উঠল মন্টগোমারি, 'কী হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।' ক্ষণেক বিরতির পর আবার বলল, 'বোকামি করে ফেলেছি। আমার চাকরটাকে শিখিয়েছিলাম কীভাবে খরগোসের চামড়া ছিলে মাংস রান্না করতে হয়। পরে দেখি নিজের হাত চাটছে সে। ঘটনাটা আগে কখনও মনেই পড়েনি আমার! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থামাতে হবে ব্যাপারটা। ডক্টর মরোকে বলতে হবে এখনই।'

ফেরার পথে আরেকটা কথাও বলল না সে।

ঘটনাটা শুনে মন্টগোমারির চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন মরো। বলাই বাহুল্য, দু'জনের চেহারাতেই আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ; ব্যাপারটা লক্ষ করে আমিও আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম কিছুটা।

মরো বললেন, 'আমি নিশ্চিত, ঘটনাটার জন্য চিতাবাঘ-মানবই দায়ী। কিন্তু প্রমাণ করবো কীভাবে? ইস্‌স্‌, মন্টগোমারি, তোমার যে কেন মাংস খাওয়ার সাধ হয়েছিল বুঝি না!'

'খুব বড় বোকামি হয়ে গেছে,' স্বীকার করে নিল মন্টগোমারি। 'কিন্তু এখন তো আর আফসোস করে লাভ নেই। তাছাড়া খাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে, তখন কিন্তু অনুমতি দিয়েছিলেন আপনি।'

'খুঁজে বের করতে হবে চিতাবাঘ-মানবকে,' বললেন মরো। 'একটা বিহিত করতে হবে ওর। না জানি কী ঘটবে সামনে!...আচ্ছা, ম্লিংকে যদি সঙ্গে নেই, তাহলে লাভ হবে কোনো?'

'জানি না,' বলল মন্টগোমারি। 'ওকে...আজকাল কেমন অপরিচিত মনে হয় আমার।'

সেদিনই বিকেলে মরো, মন্টগোমারি, ম্লিং আর আমি রওয়ানা হলাম পশুমানবদের কুঁড়েঘরগুলোর উদ্দেশে। ম্লিং বাদে আমাদের তিনজনের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। ম্লিং-এর এক হাতে হালকা একটা কুড়াল, ওটা দিয়ে কাঠ কেটে লাকড়ি বানায় সে; আরেক হাতে তারের কুণ্ডলী। রাখালদের শিঙার মতো বিশাল একটা শিঙা ঝুলছে মরোর কাঁধে।

সারা রাস্তায় একটা কথাও বললেন না তিনি। মুখটা গম্ভীর হয়ে আছে তাঁর, সেখানে কেমন সাদা সাদা ছোপ—ভয়ঙ্কর কিছু একটার আভাস পাচ্ছি যেন।

গভীর আর সঙ্কীর্ণ উপত্যকা পার হয়ে হাজির হলাম গরম পানির নদীটার সামনে। ওটা পার হওয়ার পর সামনে পড়ল আখের-ঝোপে-ভরা আঁকাবাঁকা পথটা। বেশ কিছুদূর এগোলাম, তারপর বদলে গেল মাটির ধরন; খেয়াল করলাম বিস্তৃত এলাকার প্রায় পুরোটাই ঢেকে আছে হলুদ রঙের পাউডারের মতো পুরু একজাতীয় পদার্থে—সম্ভবত সালফার। সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমি, আগাছায় ভরা একদিকের কিনারা থেকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে পানিতে। চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সমতল একটা জায়গায় উপস্থিত হলাম কিছুক্ষণ পর, থামলাম সেখানেই। কাঁধ থেকে শিঙাটা নামিয়ে বাজালেন ডক্টর মরো, ভেঙে খানখান হয়ে গেল বিকেলের নিস্তব্ধতা। তাঁর ফুসফুসের জোর দেখে অবাক না-হয়ে পারলাম না। আওয়াজটা বাড়তে বাড়তে প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পুরো উপত্যকায়, একসময় মনে হতে লাগল কান ফেটে যাবে।

শিঙাটা নামিয়ে জায়গামতো ঝুলিয়ে রাখলেন মরো, একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আহ্!'

বাঁশঝাড়ের ভিতরে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, দূরের জঙ্গল থেকে ভেসে এল কথাবার্তার নিচু কিন্তু স্পষ্ট আওয়াজ। তাকালাম সেদিকে, যে-জলাভূমি ধরে পালিয়েছিলাম আগের দিন, সেটা দেখতে পেলাম। গন্ধকময় মাটির বিস্তৃত প্রান্তের তিন কি চার দিক দিয়ে বলতে গেলে ছুটে আসতে লাগল কিম্ভূতকিমাকার পশুমানবরা। দৃশ্যটা দেখে ভয়ে গা শিরশির করে উঠল আমার। গাছ বা নলখাগড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে এক জনের পর একজন, তারপর অনেকটা টলতে টলতে এগিয়ে আসছে তপ্ত মাটির উপর দিয়ে। মরো আর মন্টগোমারির দেখি কোনো বিকার নেই, ধীরস্থির শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনই।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ওদের দু'জনের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

অনেক কাছে এসে পড়েছে পশুমানবরা, দাসের মতো জড়সড় হয়ে একে একে দাঁড়াচ্ছে মরোর সামনে। সুর করে "প্রার্থনা-সঙ্গীত" গাইছে কেউ কেউ, এক জনের ছন্দ বা চরণের সঙ্গে আরেকজনের ছন্দ বা চরণের মিল নেই। মরোর থেকে ত্রিশ গজের মতো দূরত্ব রেখে থেমে দাঁড়াল সবাই, কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় বসে পড়ল মাটিতে।

অভাবনীয় একটা দৃশ্য! হলদে মাটির বিস্তৃত একটা প্রান্তরে, জ্বলন্ত নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছি আমরা তিন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, সঙ্গে কালোমুখের এক চাকর; প্রায় বৃত্তাকারে আমাদের ঘিরে ধরেছে কিম্ভূত কতগুলো জন্তু, অবনত হয়ে আছে ওদের সবাই, অঙ্গভঙ্গি করছে অদ্ভুত কায়দায়।

'বাষট্টি, তেষট্টি,' গুনছেন মরো, 'বাকি চারজন গেল কোথায়?'

'চিতাবাঘ-মানবকে তো দেখতে পাচ্ছি না,' বললাম আমি।

শিঙাটা আবার বাজালেন মরো। আওয়াজ শুনে মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল পশুমানবরা, তারপর শরীর মোচড়াতে লাগল। তখন দেখি, বাঁশজঙ্গলের ভিতর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এল চিতাবাঘ-মানব, পশুমানবদের কায়দায় বসে পড়ল মাটিতে, যোগ দেয়ার চেষ্টা করল বাকিদের সঙ্গে। বানর-মানব এল সবার শেষে। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা পশুমানবদের কেউ কেউ মুখ তুলে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'থামো!' উঁচু গলায় বললেন মরো।

"পূজা" করা থামিয়ে উরুর উপর ভর দিয়ে বসল পশুমানবরা।

'আইন-পাঠক কোথায়?'

ধূসর চুলের দানব মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে "প্রণাম" করল মরোকে।

'আইনগুলো বলো,' আদেশ দিলেন মরো।

শুরু হলো আরেক অদ্ভুত কাণ্ড। এপাশ-ওপাশ দুলতে আরম্ভ করল হাঁটু-গেড়ে-বসে থাকা পশুমানবরা, খাবলা মেরে প্রথমে ডান পরে বাম হাতের মুঠি ভরে তুলতে আর ফেলতে লাগল গন্ধকময় মাটি, একইসঙ্গে আবৃত্তি করতে লাগল ওদের অদ্ভুত নিয়মগুলো।

"মাংস বা মাছ কিছুই খাওয়া যাবে না, সেটাই আইন"– পশুমানবরা এ-পর্যন্ত আসামাত্র হাত তুললেন মরো। চিৎকার করে বললেন, 'থামো!'

নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক।

কোনো কারণে আতঙ্কিত হয়ে আছে পশুমানবরা। কারণটা কী আমি না-জানলেও ওরা জানে। ওদের অদ্ভুত চেহারাগুলোর দিকে তাকালাম। সবার চোখেমুখে সঙ্কুচিত একটা ভাব আর গোপন একটা ভয় দেখে মনে হলো, এখনও পশুই রয়ে গেছে সবাই, মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও পায়নি আসলে।

'ওই আইনটা অমান্য করা হয়েছে,' বললেন মরো।

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' বলল এক পশুমানব, অন্যরাও কথাটা উচ্চারণ করল কয়েকবার।

'কে?' আবার চেঁচালেন মরো। 'কে ভেঙেছে আইনটা?'

জবাব নেই।

সামনের ভয়ার্ত মুখগুলোর দিকে তাকালেন মরো, বাতাসে সপাং করে চালালেন হাতের চাবুক। হায়েনা-শূকর মানব আর চিতাবাঘ-মানবের মুখ আরও শুকিয়ে গেল বলে মনে হলো আমার।

'কে করেছে কাজটা?' বজ্রকণ্ঠে আবারও জানতে চাইলেন মরো।

এবারও অপরাধ স্বীকার করল না কেউ।

চিতাবাঘ-মানবের চোখে চোখ রাখলেন মরো; একদৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যে, আমার মনে হলো জন্তুটার ভিতর থেকে টেনে প্রাণ বের করে নিয়ে আসছেন।

'আইন যে ভাঙে,' চিতাবাঘ-মানবের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন তিনি, কিন্তু তাঁকে কথা শেষ করতে দিল না পশুমানবের দল, সম্মিলিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেদনা-নিবাসে।'

'শুনেছ?' চিতাবাঘ-মানবের দিকে আবার তাকালেন মরো।

প্রতিক্রিয়া হলো ভয়ানক। এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে ছিল, এবার একলাফে উঠে দাঁড়াল জন্তুটা। চোখের পলকে ছুটে এল ত্রিশ গজ। দু'চোখ জ্বলছে ওর, কোঁচকানো দু'ঠোঁটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে শ্বদন্ত। মরোকে ধরার জন্য লাফ দিল সে।

দাঁড়িয়ে গেছে পশুমানবরা। রিভলভার বের করলাম আমি। চিতাবাঘ-মানবের জোরালো ধাক্কায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন মরো, টলছেন এখন। চারপাশে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ভয়াবহ গর্জন। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। আমার কাছ দিয়েই দৌড় দিল চিতাবাঘ-মানব, ওর পিছু নিল ম্লিং। হায়েনা-শূকর মানবের হলুদ চোখদুটো দেখলাম জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়, আমাকে আক্রমণ করবে কি না ভাবছে বোধহয়। মরোর পিস্তলটা গর্জে উঠল হঠাৎ, আলোর একটা ঝলকানি দেখলাম ছুটে গেল পশুমানবদের দিকে। আগুনের ঝলক থেকে যত দূরে পারে সরার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

ধাক্কা খেয়ে আমিও সরে এলাম খানিকটা দূরে। পরমুহূর্তে খেয়াল করলাম, নিজের অজান্তেই দৌড়াতে শুরু করেছি, মিশে গেছি পশুমানবদের ভিড়ের মধ্যে, ধাওয়া করছি পলায়নরত চিতাবাঘ-মানবকে।

সবার সামনে স্লিং। চিতাবাঘ-মানবের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই সে। ওর পেছনে নেকড়ে-মানবী, জিভ বেরিয়ে গেছে ওর। তারপর কয়েকজন শূকর-মানব আর দুই ষাঁড়-মানব। ওদের পেছনে মরো। তাঁর স্ট্র-হ্যাটটা উড়ে গেছে, হাতে রিভলভার, লম্বা সাদা চুল উড়ছে বাতাসে। শূকর-মানব দৌড়াচ্ছে আমার পাশাপাশি, আমার সঙ্গে তাল বজায় রেখে। জ্বলজ্বলে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু পর পর চোরাদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে সে।

বাঁশজঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে যত জোরে পারে ছুটছে চিতাবাঘ-মানব। ওর ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে বাঁশগুলো, সে চলে যাওয়ামাত্র স্প্রিং-এর মতো ফিরে আসছে আগের জায়গায়। অদ্ভুত একজাতের খট খট আওয়াজ হচ্ছে।

জঙ্গলের ধারে পৌঁছানোর পর পায়ে-চলা একটা পথ খুঁজে পেলাম। সিকিমাইল এগোনোর পর আরও ঘন হলো জঙ্গল, আমাদের গতি কমে গেল অনেক। তারপরও এগিয়ে চললাম আমরা। ঘন হয়ে জন্মানো গাছের পাতা বার বার আঘাত করছে আমাদের মুখে, পাতার লতানো অংশ জড়িয়ে যাচ্ছে থুতনিতে কিংবা আগাছায় আটকে যাচ্ছে পা একটু পর পর, কাঁটাগাছের সঙ্গে ঘষা লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে কাপড় অথবা কেটে যাচ্ছে চামড়া।

আমার কিছুটা সামনেই মরো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'চার হাতপায়ে ভর দিয়ে পালিয়েছে শয়তানটা।'

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল,

অথবা বলা ভালো মুখ ব্যাদান করল এক পশুমানব, দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন পর কাউকে ধাওয়া করতে পেরে যার-পর-নাই খুশি সে।

কিছু বললাম না। এগিয়ে চললাম আমরা। জঙ্গল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ একটা প্রান্তরে হাজির হলাম কিছুক্ষণ পর। দূরে কয়েকটা পাহাড়। আমাদের থেকে বেশ কিছুটা সামনে চিতাবাঘ-মানব। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে দৌড়াচ্ছে সে, কিছুক্ষণ পর পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে আমাদেরকে আর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ছে। শুনে খুশিতে গর্জন করে উঠল দুই নেকড়ে-মানবও।

এখনও কাপড় পরে আছে চিতাবাঘ-মানব। এত দূর থেকেও ওকে মানুষের মতোই মনে হচ্ছে, কিন্তু দেহের ভঙ্গি বিড়ালগোত্রীয় প্রাণীদের মতো। পরিশ্রমে দু'কাঁধ কিছুটা ঝুলে পড়েছে ওর। হলুদ ফুলওয়ালা কাঁটাযুক্ত একটা ঝোপের কাছে গিয়ে হাজির হলো সে, লাফিয়ে পার হলো ঝোপটা, তারপর লুকিয়ে পড়ল কোথাও। ওই ঝোপ থেকে তখনও অনেকখানি দূরে আছে ম্লিং।

প্রথমে যে-গতিতে দৌড়াচ্ছিলাম, এখন সে-গতি নেই আমাদের অনেকেরই। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছি আমরা; আগে এগোচ্ছিলাম কলাম করে—একজনের পেছনে আরেকজন, এখন পাশাপাশি, লম্বা একটা লাইনের মতো অনেকটা। হায়েনা-শূকর মানব এখনও আছে আমার পাশে, দৌড়াতে দৌড়াতে বার বার দেখছে আমাকে, নাকমুখ কুঁচকে হাসছে। যে-রাতে দ্বীপে এসেছিলাম সে-রাতে যে-অন্তরীপ ধরে আমাকে ধাওয়া করেছিল চিতাবাঘ-মানব, পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছানোর পর বোধহয় বুঝতে পারল সে ওই অন্তরীপের দিকেই এগোচ্ছে। হঠাৎ দিক পাল্টাল সে, কিন্তু মন্টগোমারি ধরে ফেলল ওর চালাকি, পথ রোধ করে দাঁড়াল। সুতরাং আগের পথ বেছে নিতে বাধ্য হলো জন্তুটা।

টলতে টলতে এগোচ্ছি আমি, মাথা ঘোরাচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছি স্পষ্ট, মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ পরই ভবলীলা সাঙ্গ হবে আমার, কিন্তু না-দৌড়েও পারছি না। হায়েনা-শূকরটা বার বার যে-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি যদি সবার থেকে পিছিয়ে পড়ি তাহলে আমাকে একা পেয়ে যে-কোনো কিছু করে ফেলতে পারে। কাজেই বিকেলের কড়া রোদ আর আমার প্রচণ্ড ক্লান্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললাম।

শেষপর্যন্ত একসময় অনেক কমে গেল আমাদের গতি, কারণ দ্বীপের এককোনায় আটকা পড়ে গেছে চিতাবাঘ-মানব, পালানোর রাস্তা নেই। এবার সবার আগে ডক্টর মরো, চাবুকটা তাঁর হাতে। আমরা বাকিরা তাঁর পেছনে, আঁকাবাঁকা একটা লাইনের মতো, চিৎকার করতে করতে এগোচ্ছি। ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছি আমাদের শিকারকে। সামনে কতগুলো ঝোপ, ওগুলোর কোনোটার আড়ালে নিঃশব্দে ওত পেতে বসে আছে সে।

ঝোপগুলোর দিকে আরও কিছুটা এগিয়েছি, এমন সময় চেঁচিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করলেন মরো, 'সাবধান! আস্তে!'

ঝোপগুলোর থেকে কিছুটা দূরে, একটা ঢালের উপর দিয়ে এগোচ্ছি আমি। সৈকত ধরে হাঁটছেন মরো আর মন্টগোমারি। ঝোপজঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই। চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেছে আমাদের, সতর্ক হয়ে উঠেছি সবাই।

ডানদিকে, প্রায় বিশ গজ দূর থেকে হঠাৎ কথা বলে উঠল বানর-মানব, 'বেদনার বাড়িতে ফিরে যাবে সে, বেদনার বাড়িতে!'

সামনে কালচে-সবুজের সমাহার, ছায়া ছায়া অন্ধকারের ভেতরে দৃষ্টি চলে কি চলে না। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎই দেখে ফেললাম চিতাবাঘ-মানবকে। আমার পা দুটো

নিশ্চল হয়ে গেল আপনা থেকেই। জ্বলন্ত দুই সবুজ চোখ মেলে একদৃষ্টিতে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দেরি না-করে আমার রিভলভারটা বের করলাম। জন্তুটার ভীত-বিহ্বল দু'চোখের মাঝখানে তাক করলাম, তারপর টেনে দিলাম ট্রিগার। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হায়েনা-শূকর, একদৌড়ে গিয়ে হাজির হলো চিতাবাঘ-মানব যে-ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেখানে, তারপর রক্তপিপাসু দাঁতগুলো বসিয়ে দিল মৃত জন্তুটার ঘাড়ে। হই হই করতে করতে ছুটে যাচ্ছে অন্য পশুমানবরাও। একটু আগেও চারপাশ ছিল নিস্তব্ধ, আর এখন কোলাহলে কান পাতা দায়।

'মারবেন না, প্রেনডিক!' আর্তনাদ করে উঠলেন মরো। 'মারবেন না!'

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। মাথা নুইয়ে ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেলেন মরো, চাবুকের হাতল দিয়ে বাড়ি দিয়ে তাড়ালেন হায়েনা-শূকরকে।

চিতাবাঘ-মানবের শরীরটা তখনও কাঁপছে, রক্তলোলুপ পশুমানবরা ঘিরে ধরেছে ওকে, মরো আর মন্টগোমারি মিলে তাড়াচ্ছেন মাংসাশী প্রাণীগুলোকে। এমনকী স্লিংকেও দেখলাম খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে। পশুমানবদের কনুইয়ের ধাক্কা খাচ্ছি বার বার। চারপাশে ওদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে গেছে যে, মৃত চিতাবাঘ-মানবকে দেখার জন্য জায়গা করে নিতে নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে ওরা।

'ভুল করে ফেলেছেন, প্রেনডিক!' আফসোস করে উঠলেন মরো। 'ওকে জ্যান্ত ধরতে চেয়েছিলাম আমি।'

'দুঃখিত,' বললাম বটে, কিন্তু আসলে একটুও দুঃখ হচ্ছে না আমার। 'উত্তেজনায় মাথা ঠিক ছিল না।'

এত লম্বা একটা সময়ের পরিশ্রম আর উত্তেজনা হঠাৎ পেয়ে বসল আমাকে, অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। ফিরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করলাম। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগলাম চারপাশে জড়ো হওয়া পশুমানবদের, পথ করে নিলাম নিজের জন্য। ঢাল বেয়ে রওনা হলাম অন্তরীপের দিকে। মরোর চিৎকার ভেসে এল কানে, চিতাবাঘ-মানবের মৃতদেহটা টেনে পানির কাছে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন তিনি ষাঁড়-মানবদের।

একা হতে পেরে ভালোই লাগছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম একবার। পশুমানবদের কৌতূহলে ভাটা পড়েনি এখনও। ষাঁড়-মানবরা সৈকতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মৃতদেহটা, লম্বা একটা দড়ির মতো পিছন পিছন যাচ্ছে ওরা। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে আর চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠছে একটু পর পর।

অন্তরীপের কাছে পৌঁছানোর পর আরেকবার তাকালাম সৈকতের দিকে। সন্ধ্যার আকাশের পটভূমিতে ষাঁড়-মানবদের কালো দেখাচ্ছে, ভারী শব টানতে টানতে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে ওরা এখনও। হঠাৎ একটা চিন্তা জাগল মাথায়—অবর্ণনীয়, উদ্দেশ্যহীন কী ঘটছে এই দ্বীপে ভাবলাম আবারও। বানর-মানব, হায়েনা-শূকর এবং আরও কিছু পশুমানব জড়ো হয়েছে সৈকতে, দাঁড়িয়ে আছে মরো আর মন্টগোমারির সঙ্গে। এখনও উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা, মন্ত্রপাঠের মতো জোরে জোরে আউড়াচ্ছে দ্বীপের আইনগুলো। কিন্তু কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে সবই আসলে বৃথা—চিতাবাঘ-মানব একা খুন করেনি খরগোসটাকে, হায়েনা-শূকরও জড়িত ছিল ওই অপকর্মের সঙ্গে। অদ্ভুত এক উপলব্ধিতে ছেয়ে গেল মন: পশুমানবদের কুৎসিত চেহারা আর কিম্ভূত আকৃতি বাদ দিয়ে যদি বলি মানবজাতির ক্ষুদ্র অথচ পূর্ণাঙ্গ একটা নমুনা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে তাহলে বোধহয় ভুল হবে না।

পশুমানবদের আচরণে আছে মানব প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ; আর ওদের কাজেকর্মে আছে ডক্টর মরো, অর্থাৎ ভাগ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার স্পষ্ট নমুনা। চিতাবাঘ-মানবের ব্যাপারটা বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনামাত্র।

পশুমানবদের উপর করুণাই হলো আমার। মরোর নিষ্ঠুরতার বাস্তব চিত্রটা আরও যেন জ্যান্ত হয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলাম, কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ সহ্য করে পশু থেকে "পশুমানব" হয় জন্তুগুলো। একবার শুধু চিৎকার শুনেই পুরো শরীর শিউরে উঠেছিল আমার, আর যে জন্তুটাকে কাটাছেঁড়া করেছিলেন মরো, সেটার না-জানি কতখানি কষ্ট হয়েছিল! বনের পশু বনেই ভালো ছিল, নিজেদের প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে থাকলেও দোষের কিছু ছিল না তাতে, এখন ওরা বাঁধা পড়ে গেছে মনুষ্যত্বের শিকলে—সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে ওরা, ওই ভয় কখনও যায় না, যে-আইনের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না সেই আইন মেনে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু কেন? বোধগম্য কোনো উদ্দেশ্য যদি থাকত মরোর, তবুও না-হয় মেনে নেওয়া যেত। পুরো ব্যাপারটাই কি তাহলে প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানীর অদ্ভুত খেয়াল মাত্র?

সতেরো

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও ছ'টা সপ্তাহ। ডক্টর মরোর এই উদ্ভট গবেষণা নিয়ে আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার, বরং এখন

ব্যাপারটা মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আমি। সারাদিন একটাই চিন্তা ঘুরপাক খায় মাথায়—কবে এই দ্বীপ ছেড়ে ফিরে যেতে পারবো লোকালয়ে। ইংল্যান্ডে যাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তাদের কথা আজকাল স্বপ্ন বলে মনে হয়। মন্টগোমারিকেও কেমন অচেনা লাগে, টের পাই ওর সঙ্গে আমার কেমন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। লোকজনের কাছ থেকে ওর দূরে দূরে থাকাটা, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাওয়ার বদাভ্যাস, পশুমানবদের প্রতি সহমর্মিতা—কোনো কিছুই ভালো লাগে না। ওদের কাছে এখনও নিয়মিত যায় সে-একা, ওর সঙ্গে যাই না আমি। পশুমানবদের কাছ থেকেও দূরে থাকি যতটা সম্ভব। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাই সৈকতে, জাহাজ দেখার আশায় তাকিয়ে থাকি দিগন্তের দিকে, কিন্তু কোনো জাহাজ আসে না। সময় কেটে যাচ্ছিল এভাবেই, মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটল একদিন।

আমার এই দ্বীপে আসার সাত কি আট সপ্তাহ পরে একদিন সকাল ছ'টারও আগে ঘুম ভেঙে গেল আমার। জ্বালানি কাঠ নিয়ে বাড়িতে এসেছে তিন পশুমানব, সে-শব্দেই ভেঙেছে ঘুমটা। অলসভাবে শুয়ে-বসে না-থেকে নাস্তা সেরে নিলাম, তারপর বাড়ির বাইরে এসে খোলা একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছি, একইসঙ্গে উপভোগ করছি সকালের তাজা বাতাস। ডক্টর মরোও বেরিয়ে এলেন কিছুক্ষণ পর, সম্ভাষণ জানালেন আমাকে, কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার গিয়ে ঢুকলেন তাঁর "প্রাসাদে"। তারপর সশব্দে ল্যাবরেটরির দরজাটা খুলে ঢুকে গেলেন ভিতরে। বিভীষিকাময় এ-জায়গার উপর থেকে মন পুরোপুরি উঠে গেছে আমার, সুতরাং মরো কী করেন বা না-করেন সে-ব্যাপারে একটুও আগ্রহ বোধ করি না; যে-পুমাটাকে নিয়ে এখন গবেষণা করছেন তিনি সেটার আর্তচিৎকার শুনেও

খারাপ লাগে না আগের মতো। মরো ল্যাবরেটরিতে ঢোকার কিছুক্ষণের ভেতরেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করল জন্তুটা, আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম নির্বিকারের মতো।

হঠাৎ কী যেন ঘটল। সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র একটা চিৎকার শুনতে পেলাম পেছনে, পতনের আওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকালাম আমি এবং দেখলাম ভয়ঙ্কর কিছু একটা ছুটে আসছে আমার দিকে। ভয়ঙ্কর বললে বোধহয় কম বলা হয়, নারকীয় কিছু একটা—না মানুষ, না জন্তু; বাদামি শরীরের পুরোটা জুড়ে লাল লাল কাটাদাগ, বেশিরভাগ ক্ষতই শুকায়নি, বরং আবার কেটে গেছে, ফোঁটায় ফোঁটায় বের হচ্ছে রক্ত, পাতাবিহীন দু'চোখ জ্বলছে ধক ধক করে। চোখের নিমেষে কাছে এসে পড়ল জিনিসটা, প্রচণ্ড এক থাবা মারল আমাকে। একটা হাত তুলে ঠেকানোর চেষ্টা করলাম আঘাতটা, কনুই ভেঙে গেল আমার, উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। শরীরের জায়গায় জায়গায় রক্তে-লাল ব্যাণ্ডেজ মোড়ানো দানবটা আমাকে ডিঙিয়ে চলে গেল আরেকদিকে। গড়াতে শুরু করলাম আমি, চলে এলাম সৈকতে। উঠে বসার চেষ্টা করছিলাম, হিতে বিপরীত হলো—মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম আবার, ভাঙা কনুইটা চাপা পড়ল শরীরের নীচে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মরো এমন সময়। কপাল কেটে গেছে তাঁর, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে, বিশাল সাদা মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আরও। এক হাতে রিভলভার। আমার দিকে একবারমাত্র তাকিয়েই পুমাটার পিছন পিছন ছুটতে শুরু করলেন আবার।

ভালো হাতটাতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। সামনে বিস্তৃত সৈকত, সেটা ধরে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে ছুটে পালাচ্ছে পুমাটা,

ওটাকে ধরবার জন্য মরোও দৌড়াচ্ছেন যতটা জোরে সম্ভব। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল জন্তুটা, দেখল মরোকে। তারপর গতি বাড়িয়ে দিল আরও, ঝোপজঙ্গলের দিকে যাচ্ছে এখন, প্রতি কদমে আরও দূরে সরে যাচ্ছে মরোর থেকে। ঝোপজঙ্গলের কাছে পৌঁছে একলাফে ভিতরে ঢুকে গেল সেটা। দৌড়াতে দৌড়াতেই গুলি করলেন মরো। কিন্তু কিছুই হলো না পুমাটার, ঝোপগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল সেটা। কিছুক্ষণ পর মরোও গিয়ে হাজির হলেন ঝোপগুলোর কাছে, ঢুকে গেলেন ভিতরে। এরপর আর দেখা গেল না তাঁকে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওদিকে, কনুই-এর প্রচণ্ড ব্যথাটা টের পেলাম হঠাৎ। গোঙাতে গোঙাতে উঠে দাঁড়ালাম, টের পেলাম টলছি কিছুটা। হাতে রিভলভার নিয়ে মন্টগোমারি হাজির হলো এতক্ষণে। 'খোদা!' আমার দিকে ভালোমতো না-তাকিয়েই বলল সে, 'পুমাটা পালিয়েছে! শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, ভেঙে ফেলেছে! পিছন পিছন ধাওয়া করে গেছেন মরো। দেখেছেন নাকি ওদের দু'জনকে?' আমি কিছু বলছি না দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে আপনার?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে গিয়েছিলাম পুমাটার সামনে, শিকলের মতো আমাকেও বোধহয় ভেঙে ফেলার ইচ্ছা হয়েছিল ওটার। থাবা খেয়েছি।'

আমার দিকে এগিয়ে এল মন্টগোমারি। ভাঙা হাতটা সাবধানে তুলে নিল নিজের হাতে। 'শার্টের হাতা তো দেখি রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।' সময় নিয়ে হাতাটা গুটিয়ে দিল সে। তারপর রিভলভারটা পকেটে রেখে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতরে, আমার ঘরে।

বলল, 'আপনার হাতটা ভেঙে গেছে।...ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো? কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনাটা?'

যা দেখেছি, ভাঙা ভাঙা কথায়, ব্যথায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম। মন দিয়ে শুনল মন্টগোমারি, সেই ফাঁকে দক্ষহাতে দ্রুত ব্যান্ডেজ করে দিল আমার হাতটা। বাড়তি একটুকরো কাপড়ে বেঁধে স্লিং-এর মতো করে হাতটা ঝুলিয়ে দিল ঘাড়ের সঙ্গে, তারপর কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে আমাকে দেখল একনজর। বলল, 'কাজ হয়ে যাবে। এবার?'

উত্তর দিলাম না। উত্তর জানিও না আসলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল মন্টগোমারি। তারপর চলে গেল। একটু পর শুনলাম, বাড়ির সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে সে।

ভাঙা হাতটা নিয়ে তেমন একটা চিন্তিত নই আমি। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে সামনে আরও ভয়াবহ কিছু ঘটবে, আমার হাত ভেঙে যাওয়াটা সেসবের সূচনামাত্র। বসে পড়লাম ডেক চেয়ারটাতে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল মন্টগোমারি। মুখটা মলিন হয়ে গেছে বেচারার, ঝুলে পড়েছে নীচের ঠোঁট, নীচের মাড়ি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

'ডক্টর মরোর কোনো পাত্তা নেই,' বলল সে, 'ঝোপজঙ্গলের ওখানে খুঁজলাম কিছুক্ষণ, কিছুই চোখে পড়ল না। আমার মনে হয় আমার সাহায্যের দরকার তাঁর।' অভিব্যক্তিহীন চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। 'পুমাটা খুব শক্তিশালী। টান মেরে দেয়াল থেকে শিকলের গোড়া ছুটিয়ে ফেলেছে জন্তুটা।' জানালার কাছে এগিয়ে গেল সে, তারপর হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। ঘুরল আমার দিকে। 'আমাকে যেতে হবে। পুমাটাকে একা সামলাতে পারবেন না মরো। একটা রিভলভার রেখে যাচ্ছি আপনার জন্য।' কিছুক্ষণ ইতস্তত করল বেচারা,

তারপর বলেই ফেলল, 'ভয় লাগছে আমার।'

রিভলভারটা ঠিক আছে কি না একবার দেখে নিয়ে আমার হাতের কাছে, টেবিলের উপর রাখল সে। তারপর চলে গেল। টের পেলাম ওর ভয়টা সংক্রামিত হচ্ছে আমার মধ্যেও, যত সময় যাচ্ছে তত বেশি অস্থিরতা পেয়ে বসছে আমাকে। শেষপর্যন্ত সহ্য করতে পারলাম না আর, মন্টগোমারি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রিভলভারটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

সকালটা নিথর, নিস্পন্দ। বাতাস পড়ে গেছে, সরসর শব্দ নেই। পালিশ করা কাচের মতো দেখাচ্ছে সমুদ্রটা। খাঁখাঁ করছে আকাশ, সৈকত একেবারে নির্জন। চারপাশের এই সমাহিত ভাব আমার অস্থিরতা বাড়িয়ে দিল আরও। শিস বাজানোর চেষ্টা করলাম, মরা একটা সুর বের হলো। গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ির এক কোনায়। যে-ঝোপজঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন মরো, মন্টগোমারিও গেছে পিছন পিছন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। কখন ফিরবে ওরা? আদৌ ফিরবে কি? সৈকতে, এখান থেকে অনেক দূরে, একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল হঠাৎ; ভালোমতো তাকিয়ে দেখি ধূসর এক পশুমানব হাজির হয়েছে কখন যেন। দৌড়ে পানির কাছে গেল জন্তুটা, তারপর জলকেলি শুরু করল মনের আনন্দেই হয়তো। এক পা দু'পা করে পিছিয়ে এলাম আমি, বাড়ির সদর দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। তারপর আবার গিয়ে দাঁড়ালাম আগের জায়গায়। শুরু হলো বাড়ির সীমানা ঘেঁষে আমার পায়চারি—পাহারাদারদের মতো। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা মন্টগোমারির ডাক শুনতে পেলাম একবার, 'মো...ও...রো...। ডক্টর মো...ও...রো...।'

হাতের ব্যথা কিছুটা কমে এসেছে ইতোমধ্যে, কিন্তু কেমন একটা জ্বর জ্বর ভাব আর প্রচণ্ড একটা তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে

আমাকে। সময় যত যাচ্ছে ছায়া তত ছোট হয়ে আসছে আমার। দূরের ওই পণ্ডমানবটাও চলে গেল একসময়। মরো আর মন্টগোমারির জন্য চিন্তা আরও বাড়ল। ওরা কি সত্যিই ফিরবে না? কিছু একটা নিয়ে মারামারি করছে তিনটা সামুদ্রিক পাখি, তাকিয়ে তাকিয়ে ঘটনাটা দেখলাম কিছুক্ষণ।

তারপর হঠাৎ শুনতে পেলাম গুলির আওয়াজ। বহু দূর থেকে এসেছে শব্দটা। অনেকক্ষণ কোনো শব্দ নেই, তারপর আবার গুলি করল কেউ। এবার তীব্র একটা আর্তনাদ শোনা গেল, আগের চেয়ে কাছে। এরপর সবকিছু চুপচাপ আবার। টের পেলাম আমার স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছে ক্রমাগত। আরেকবার গুলির শব্দ পেলাম, টলতে টলতে ছুটে গেলাম বাড়ির এক কোনার দিকে। বিধ্বস্ত মন্টগোমারিকে দেখতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। পরিশ্রমে মুখটা লাল হয়ে গেছে বেচারার, চুল এলোমেলো, প্যান্টের হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে গেছে, চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক। পেছনে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ম্লিং। ওর চোয়ালে অদ্ভুত কতগুলো দাগ।

'মরো এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল মন্টগোমারি।

'না,' এক শব্দে জবাব দিলাম।

'খোদা!' এতক্ষণ হাঁপাচ্ছিল মন্টগোমারি, কিন্তু এখন ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে ফোঁপাচ্ছে যেন, 'ভিতরে চলুন।' আমার হাত ধরল সে। 'ওরা সব পাগল হয়ে যাচ্ছে! মাথার ঠিক নেই একটারও। কী হবে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কথাও বলতে পারছি না ঠিকমতো। একটু দম নিয়ে নেই, দাঁড়ান। আমার ব্র্যান্ডির বোতল কোথায়?'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ভিতরে ঢুকল মন্টগোমারি, ওর পিছন পিছন গেলাম আমি। আমার ঘরে ঢুকে ডেক চেয়ারটাতে

বসল সে। দরজার বাইরে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে ধপাস করে বসে পড়ল স্লিং, হাঁপাতে লাগল কুকুরের মতো। মন্টগোমারির জন্য ব্র্যান্ডি আর পানি নিয়ে এলাম। শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে বেচারা, ধাতস্থ হচ্ছে আস্তে আস্তে। কয়েক মিনিট পর মুখ খুলল সে, বাইরে যাওয়ার পর কী ঘটেছে বলতে শুরু করল।

ঝোপজঙ্গলের কিনারায় পৌঁছে ডক্টর মরো আর পুমাটার ট্র্যাক খুঁজে পায় সে। দোমড়ানো-মোচড়ানো পাতা বা ভাঙা ডাল, পুমাটার শরীর থেকে খসে পড়া লোম কিংবা পাতায় বা মাটিতে রক্তের ফোঁটা দেখে ওদেরকে অনুসরণ করছিল সে। ঝরনাটা ছাড়িয়ে পাথুরে মাটিতে পৌঁছানোর পর কাজটা কঠিন হয়ে যায় ওর জন্য, কোনো চিহ্ন প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। একসময় ট্র্যাক পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে সে, তখন মরোর নাম ধরে একটু পর পর চিৎকার করতে করতে উদ্দেশ্যহীনভাবে রওয়ানা হয় পশ্চিমদিকে। কাছেই কোথাও ছিল স্লিং, মন্টগোমারির ডাক শুনতে পেয়ে হালকা একটা ঝোপের আড়াল থেকে হাজির হয় সে। তারপর দু'জনে মিলে চিৎকার শুরু করে মরোর নাম ধরে। ভয়ে জড়সড় হয়ে দুই পশুমানব হাজির হয় তখন, লতাপাতার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে ওদের দু'জনকে। এই দু'জনের কেমন অদ্ভুত ঠেকে মন্টগোমারির কাছে, দুই পশুমানবকে কাছে আসতে বলে সে। কিছু সময় আসে না ওরা, মন্টগোমারির ডাক শুনে অপরাধীর মতো আসে দু'জন। ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় মন্টগোমারি, মরোর নাম ধরে চেঁচামেচি করে থামিয়ে দেয়। এদিক-সেদিক আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে শেষে গিয়ে হাজির হয় পশুমানবদের কুঁড়েঘরগুলোতে।

গিয়ে দেখে, খাঁ খাঁ করছে পুরো উপত্যকা; কোথাও কেউ

নেই।

বিপদ টের পায় মন্টগোমারি। সতর্ক হয়ে ওঠে সে, স্লিংকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরে। হঠাৎ দুই শূকরমানবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওদের। দু'জনের মুখেই রক্তের দাগ, দু'জনই যার-পর-নাই উত্তেজিত। মন্টগোমারিকে দেখামাত্র ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসে ওরা; কিন্তু কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, ভয়ঙ্কর চেহারায় তাকিয়ে থাকে মন্টগোমারির দিকে। চাবুক হাতে নেয় মন্টগোমারি, জিনিসটা দেখামাত্র ওর উপর লাফিয়ে পড়ে দুই শূকরমানব। এর আগে কোনো পশুমানব সাহস পায়নি কাজটা করার। দেরি না-করে গুলি করে মন্টগোমারি। আর মনিবকে বাঁচানোর জন্য আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্লিং। দু'জন দু'জনকে আঁকড়ে ধরে গড়াগড়ি খেতে থাকে। একসময় শূকরমানবের উপর চড়ে বসে স্লিং, তারপর দাঁত বসিয়ে দেয় জন্তুটার গলায়। তখন বাধ্য হয়ে গুলি করে শূকরমানবকে মেরে ফেলে মন্টগোমারি। কিন্তু ততক্ষণে জেগে গেছে স্লিং-এর পশুপ্রবৃত্তি, তাই ফিরে আসতে চাইছিল না সে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওকে রাজি করায় মন্টগোমারি। তারপর দু'জনে রওয়ানা হয় বাড়ির উদ্দেশে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছাতে চাচ্ছিল আমার কাছে। ফেরার সময় কী যেন দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা ঝোপের ভেতরে ঢোকে স্লিং, তারপর তাড়িয়ে বের করে আনে এক পশুমানবকে। জন্তুটার মুখে রক্ত, পায়ে ক্ষত; ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারছে না। মন্টগোমারিদের সঙ্গে কিছুদূর আসে সে, তারপর হঠাৎ দৌড় দেয় সৈকতের দিকে। মেজাজ খারাপ ছিল মন্টগোমারির, তাই জন্তুটাকে ওভাবে পালাতে দেখে গুলি করে বসে।

'এসবের মানে কী?' ওর লম্বা কাহিনী শেষ হলে জানতে চাইলাম।

মাথা নাড়ল সে, বিষণ্ণ চেহারায় আবার হাত বাড়াল ব্র্যান্ডির বোতলটার দিকে।

আঠারো

যখন দেখলাম তৃতীয় পেগ হয়ে গেছে মন্টগোমারির, কিন্তু তারপরও আরও গেলার ইচ্ছা আছে ওর, বাধা না-দিয়ে পারলাম না। ইতোমধ্যেই নেশা ধরে গেছে ওর, ঢুলুঢুলু একটা ভাব চলে এসেছে চোখেমুখে। বললাম, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু একটা হয়েছে ডক্টর মরোর, তা না হলে এতক্ষণে ফিরে আসতেন তিনি। কী হয়েছে সেটাই জানা উচিত আমাদের, প্রয়োজনে সাহায্য করা দরকার তাঁকে। এটা-সেটা বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল মন্টগোমারি, আপত্তি জানাল কয়েকবার। কিন্তু রাজি হয়ে গেল শেষপর্যন্ত। হালকা কিছু খেয়ে নিলাম আমরা তিনজনই, তারপর বেরিয়ে এলাম বাড়ির বাইরে।

সবার সামনে ম্লিং। কাঁধদুটো কিছুটা কুঁজো হয়ে আছে ওর, একটু পর পর নড়ে উঠছে অদ্ভুত কালো মাথাটা। কারণ একবার পথের এপাশে-ওপাশে, পরেরবার পথের উপর তাকাচ্ছে সে। অস্ত্র বলতে কিছু নেই ওর কাছে। শুকরমানবের সঙ্গে লড়াই করার সময় কুড়ালটা পড়ে গেছে, তুলে নেয়ার কথা মনে ছিল না বোধহয়। ধীর কদমে টলতে টলতে এগোচ্ছে মন্টগোমারি। একটা হাত প্যান্টের পকেটে, ঝুলে পড়েছে মাথাটা। ব্র্যান্ডি খেতে

বাধা দিয়েছি বলে মুখটা গোমড়া হয়ে আছে ওর, বোধহয় আমার উপর রেগেও আছে কিছুটা। আমার বাঁ হাতটা ঝুলছে স্লিং থেকে, ডান হাতে রিভলভার। উত্তর-পশ্চিমদিকে যাচ্ছি আমরা। গাছগাছালির ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ চলে গেছে, সেটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না আমাদের। কিছুদূর এগোনোর পর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল স্লিং। সতর্ক হয়ে উঠেছে সে, দেখেই বুঝতে পারছি আকস্মিক উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে ওর শরীর। আরেকটু হলেই ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত মন্টগোমারি। থেমে দাঁড়ালাম আমরা দু'জনও, কান খাড়া করলাম। ঘন গাছগাছালির আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ—নিচুকণ্ঠে কথা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'তিনি মারা গেছেন,' ভারী, কম্পিত কণ্ঠে বলল কেউ।

'না, তিনি মারা যাননি, মারা যাননি,' হড়বড় করে প্রতিবাদ করল আরেকজন।

'আমরা দেখেছি, আমরা দেখেছি,' একসঙ্গে বলে উঠল কয়েকজন।

'হ্যালো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মন্টগোমারি।

'বোকামি করে ফেলেছেন,' বলেই শক্ত করে চেপে ধরলাম আমার রিভলভারটা।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। আমাদের দিকে যারা এগিয়ে আসছিল থমকে গেছে তাদের সবাই, তারপর বোধহয় একসঙ্গে ছুটে আসতে লাগল। আশপাশে শুধু ডাল ভাঙার, পাতা ঝরার আওয়াজ; মনে হচ্ছে জড়াজড়ি করে থাকা গাছগুলো চলতে শুরু করেছে যেন হঠাৎ করেই। মুহূর্তের মধ্যে আধ ডজনের মতো চেহারা হাজির হলো চোখের সামনে। অদ্ভুত সব চেহারা, একেকটা চেহারায় ফুটে আছে একেকরকম অভিব্যক্তি। ওদেরকে

দেখামাত্র গর্জে উঠল স্লিং।

সামনে দাঁড়ানো পশুমানবদের মধ্যে বানরমানবকে চিনতে পারলাম সবার আগে। ওর কণ্ঠটা অবশ্য পরিচিত মনে হয়েছিল আগেই। মন্টগোমারির নৌকায় বাদামি-চামড়ার কয়েকজন পশুমানব দেখেছিলাম, ওদের দু'জনকেও দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। পশুমানবদের গ্রামে দ্বীপের আইন পড়ে শোনাচ্ছিল ধূসর চুলের যে উদ্ভট জন্তুটা, ওকেও দেখা গেল।

একবার হেঁচকি তুলে নীরবতা ভাঙল মন্টগোমারি, বলল, 'কে বলল কথাটা? কে বলল তিনি মারা গেছেন?'

অপরাধীর দৃষ্টিতে ধূসরচুলোর দিকে তাকাল বানরমানব।

'তিনি মারা গেছেন,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ধূসরচুলো। 'ওরা দেখেছে।'

আবার তাকালাম পশুমানবদের চেহারাগুলোর দিকে। কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কেউ। ওদের বোধহয় ধারণা ছিল ডক্টর মরো অমর, চিরন্তন। দেখে মনে হচ্ছে জটিল এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে বেচারারা, এবং সেটার সমাধান করতে না-পেরে ভয়ে, লজ্জায় গুটিয়ে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যেই।

'কোথায় তিনি?' আবার জানতে চাইল মন্টগোমারি।

'পিছনে,' জবাব দিল ধূসরচুলো।

'এই দ্বীপে কি এখন কোনো আইন আছে?' জিজ্ঞেস করল বানরমানব। 'তিনি আমাদেরকে যা যা বলেছিলেন সেভাবেই কি সব হবে? তিনি কি আসলেই মারা গেছেন?'

'দ্বীপে আসলেই কি কোনো আইন আছে এখন?' মন্টগোমারির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল বাদামি চামড়ার এক পশুমানব। 'আপনার ওই চাবুকটা ছাড়া আর কোনো আইন কি আছে?'

'তিনি মারা গেছেন,' এবার আগের চেয়েও ধীরস্থিরভাবে, অবিচল আস্থা নিয়ে বলল ধূসরচুলো।

আমরা তিনজন আর পশুমানবদের দলটা দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি; কিছু শোনার আশায়, কিছু জানার আশায় একদল আরেকদলের দিকে তাকিয়ে আছি নির্নিমেষ। বোধহয় আমাদের চেয়ে পশুমানবদের আশাটা বেশি, তাই ওদের চেহারায় ব্যগ্রতাটাও বেশি।

আমার দিকে তাকাল মন্টগোমারি। 'প্রেনডিক, তিনি সত্যিই মারা গেছেন। কোনো সন্দেহ নেই।'

ওর মুখ থেকে অমন কথা শোনার পর পশুমানবদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে কল্পনা করে নিয়ে শিউরে উঠলাম আমি। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম মন্টগোমারির পেছনে, সে কথাটা বলামাত্র গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে, পশুমানবদের মুখোমুখি। উচ্চকণ্ঠে বললাম, 'আইন মান্যকারীরা, তিনি মারা যাননি! রূপ পাল্টিয়েছেন মাত্র। তাঁর আকার পাল্টে গেছে, দেহ পাল্টে গেছে। কিছুদিনের জন্য তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না। আগে তিনি ছিলেন তোমাদের সঙ্গে, এখন,' তর্জনী দিয়ে ইশারা করলাম আকাশের দিকে, 'উপরে আছেন। ওখান থেকেই তোমাদেরকে দেখবেন, তোমরা কে কী করো না-করো সব জানতে পারবেন। তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তিনি ঠিকই তোমাদেরকে দেখতে পাবেন। সুতরাং, দ্বীপে আগে যে-আইন ছিল, এখনও সেটাই আছে। তোমাদের কাজ হচ্ছে মেনে চলা, সেটাই করতে থাকো।'

আবার তাকালাম পশুমানবদের দিকে। ওদের মধ্যে আগের সেই ভয়টা ফিরে আসছে মনে হয়, কারণ আমাকে তাকাতে দেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সবাই।

'তিনি মহান, তিনি ভালো,' বলে মুখ তুলে উপরের দিকে

তাকাল বানরমানব, যেন পাতার আড়াল থেকে রাতের আকাশে মরোকে খুঁজল সম্ভবত।

'অন্য জিনিসটার কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওটার শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়েছে,' জবাব দিল ধূসরচুলো। 'চিৎকার করতে করতে পালিয়েছে ওটা, তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে মরেছে।'

'ভালো হয়েছে,' শুনে মনে হলো পুমাটা মরেছে শুনে খুশির বদলে বিরক্তই হয়েছে মন্টগোমারি।

'তিনি মারা গেছেন,' মন্টগোমারিকে উদ্দেশ্য করে আবারও বলল ধূসরচুলো।

মন্টগোমারির নেশা অনেকখানি কেটে গেছে ইতোমধ্যে, তাই মরো মারা গেছেন–কথাটা স্বীকার করে নেওয়ার মানে কী বুঝতে পারছে। ধীরস্থিরভাবে ধূসরচুলোর বক্তব্যের প্রতিবাদ করল সে, 'না, তিনি মারা যাননি। তিনি মরতে পারেন না। আমি যেমন বেঁচে আছি, তিনিও তেমন বেঁচে আছেন।'

আমি বললাম, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আইন ভেঙেছ। যারা করেছ কাজটা তারা মরবে। এখন চলো, তাঁর পুরনো শরীরটা কোথায় আছে দেখাও। ওই শরীরটা রেখে তিনি চলে গেছেন কারণ ওই শরীরের আর দরকার নেই তাঁর।'

'চলুন,' পথ দেখিয়ে আমাদেরকে নিয়ে চলল ধূসরচুলো।

সামনে আধ ডজন পশুমানব, পেছনে আমরা তিনজন। মাথার উপরে জড়াজড়ি করে আছে গাছের ডাল আর পাতা, পায়ের নীচে লতানো গুল্ম আর শিকড়। খেয়াল করলাম, উত্তর-পশ্চিমদিকে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম সবাই, যেদিক থেকে এসেছে আওয়াজটা তাকালাম সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত পরই ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে বেরিয়ে এল খর্বাকৃতির এক

পশুমানব, ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপছে বেচারা। ওর পিছন পিছন ছুটে এল দানবাকৃতির আরেক পশুমানব, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে পুরো চেহারা। এত জোরে দৌড়াচ্ছে জন্তুটা যে, সামনে এতগুলো "লোক" দাঁড়িয়ে আছে দেখার পরও থামতে পারল না. হুড়মুড় করে সোজা এসে পড়ল আমাদের উপর। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল ধূসরচুলো। ভয়ঙ্কর এক গর্জন দিয়ে জন্তুটার উপর লাফিয়ে পড়ল মিং, কিন্তু প্রচণ্ড এক থাবা খেয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। গুলি করল মন্টগোমারি, কিন্তু দানবটার গায়ে লাগাতে পারল না; তারপর সম্ভবত আত্মরক্ষার তাগিদে নুইয়ে ফেলল মাথা, দৌড়ে পালানোর জন্য পাক খেয়ে ঘুরল। এবার গুলি করলাম আমি। লাগল কি না বুঝতে পারলাম না, কারণ আগের মতোই ছুটে আসতে লাগল দানবটা। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ওটার মুখে গুলি করলাম এবার। বিকৃত চেহারাটা আরও বিকৃত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে, মুখের আদল বলে কিছু থাকল না আর। তারপরও আমাকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল জন্তুটা, জড়িয়ে ধরল মন্টগোমারিকে। ধরে রাখল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মন্টগোমারি পড়ল ওর পাশে। ওকে আগের চেয়েও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল জন্তুটা—মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে।

আমার সামনে এখন শুধু মিং, মরা জন্তুটা, আর ধরাশায়ী মন্টগোমারি। বাকিরা পালিয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে বসল মন্টগোমারি, পাশে পড়ে থাকা মৃত পশুমানবটার দিকে তাকাল বিভ্রান্তের মতো। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরালাম, সতর্ক পদক্ষেপে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ধূসরচুলো।

ওকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'দেখলে তো, যারা এই দ্বীপের

আইন অমান্য করে তাদের পরিণতি কী হয়?'

মৃত দানবটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ধূসরচুলো। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আগুন ছোবল মারে ওদেরকে, মারা যায় ওরা।'

একজন দু'জন করে বাকিরাও ফিরে এল একসময়। "আইন" অমান্য করার শাস্তি কী দেখার জন্য কিছুটা সময় দিলাম ওদেরকে। তারপর আবার চলতে শুরু করলাম সবাই। শেষপর্যন্ত হাজির হলাম দ্বীপের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে। পুমাটার মৃতদেহ খুঁজে পেতে সময় লাগল না। গুলি লেগে কাঁধের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে বেচারার, কে বা কারা যেন আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে মরা শরীরটা, খুবলে খুবলে মাংসও তুলে নিয়ে গেছে অনেকখানি। যাঁকে খোঁজার জন্য এত কষ্ট করে এতদূর এসেছি, তাঁকে খুঁজে পেলাম আরও প্রায় বিশ গজ দূরে।

দলিতমথিত এক বাঁশঝাড়ের ভেতরে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন ডক্টর মরো। ধূসর চুলগুলোয় লেপ্টে আছে রক্ত। খুলি ফেটে গেছে বেচারার। গোড়া থেকে শিকল ছিঁড়ে ফেলে পালিয়েছিল পুমাটা, তাই শিকলের অনেকখানি রয়ে গিয়েছিল ওর থাবার সঙ্গে; থাবা দেওয়ার সময় হয়তো সেই শিকলই আঘাত করেছে মরোর মাথায়। তিনি যেখানে পড়ে আছেন, সে-জায়গার মাটিও রক্তে ভেজা। তাঁর রিভলভারটা খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। ঠেলা দিয়ে তাঁকে চিত করল মন্টগোমারি। বিশালদেহী মরোর শরীর খুব ভারী, তাই ম্লিংসহ সাত পশুমানবের কাঁধে চড়ানো হলো তাঁর মৃতদেহ। বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম আমরা। ফিরতি পথে জায়গায় জায়গায় থেমে বিশ্রাম দেয়া হলো শববাহী পশুমানবদের।

বাড়িতে যখন ফিরলাম, রাত ঘনিয়েছে ততক্ষণে। ম্লিংসহ সব

পশুমানব বিদায় নিল সদরদরজা থেকে। ভেতরে ঢুকলাম আমি আর মন্টগোমারি, সবগুলো দরজা ভালোমতো আটকে দিয়ে ধরাধরি করে মরোর মৃতদেহটা নিয়ে এলাম উঠানে, লতাপাতার একটা স্তূপের উপর শুইয়ে দিলাম সাবধানে। তারপর দু'জনে গিয়ে ঢুকলাম মরোর গবেষণাগারে, জীবিত যা কিছু পেলাম নির্দয়ের মতো হত্যা করলাম সবগুলোকে।

উনিশ

হাতমুখ ভালোমতো ধুয়ে রাতের খাবারটা সেরে নিলাম। তারপর আমার ছোট্ট ঘরটাতে এসে বসলাম দু'জনে, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে লাগলাম প্রথমবারের মতো। রাত তখন প্রায় বারোটা। মন্টগোমারির মধ্যে নেশার ছিটেফোঁটাও নেই, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিজের উপর মহাবিরক্ত সে। আমার মনে হয় পশুমানবদের মতো সে-ও বিশ্বাস করত মরো কোনোদিন মরতে পারেন না। দশ-এগারো বছর ধরে একটানা এই দ্বীপে থাকতে থাকতে ওর স্বভাবটাই অন্যরকম হয়ে গেছে, মরোর মৃত্যুতে তাই স্বাভাবিকভাবেই খুব বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে সে।

'শালা!' আক্ষেপ করে বলল মন্টগোমারি, 'কোনো লাভই হলো না। সারাটা জীবন শুধু ঠকেই গেলাম আমি। নার্স আর স্কুলমাস্টারদের বকুনি শুনতে শুনতেই কাটল প্রথম ষোলোটা বছর। তারপর ডাক্তারি পড়া পড়লাম পাঁচটা বছর-জানপ্রাণ

দিয়ে। কী কষ্টটাই না করতে হয়েছে আমাকে। লজিং থাকতাম এক বাড়িতে—খাবারের মান ছিল খারাপ, নোংরা-ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হতো, খারাপ কিছু অভ্যাসও ছিল আমার, শেষে তো বিরাট এক ভুল করে এই নরকে আসতে হলো। দশটা বছর কাটালাম এখানে! দ-শ-টা বছর! কেন? আমি কি ছেলের হাতের মোয়া?'

'শুনুন, এখন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, এই দ্বীপ ছেড়ে পালানো,' মন্টগোমারির আক্ষেপে কান না-দিয়ে কাজের কথা বললাম। 'পশুমানবদের নিয়ন্ত্রণ করা আপনার-আমার কাজ না। একটামাত্র পুমাকে "মানুষ" বানাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন মরো। আর সেখানে তো গণ্ডায় গণ্ডায় পশুমানব ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরো দ্বীপে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে আমাদের।'

'পালিয়ে হবেটা কী শুনি?' হতাশ কণ্ঠে জানতে চাইল মন্টগোমারি। 'ইংল্যান্ডে আমার না আছে ঘরবাড়ি, না আছে বন্ধুবান্ধব। সেখানে কী করবো, কার কাছে যাবো? তাছাড়া যেসব নিরীহ পশুমানব এখনও আইন মেনে চলছে, ওদেরই বা কী হবে?'

'লতাপাতার যে-স্তূপের উপর মরোর লাশ রেখেছি,' মন্টগোমারির হতাশাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম, 'ওই স্তূপটাকে চিতা বানিয়ে ফেললেই ভালো হবে বোধহয়। অন্য যে-জন্তুগুলোকে হত্যা করেছি, ওগুলোকেও একইসঙ্গে পুড়িয়ে দেয়া যাবে। পশুমানবদের ব্যাপারে কী বললেন?'

'জানি না। মরুক শালারা! মাংসাশী প্রাণী থেকে যেগুলোকে বানিয়েছিলেন মরো, ওগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করেই মরবে। ধরে ধরে তো আর সবগুলোকে খুন করা সম্ভব না। নাকি আপনার মতো ভালোমানুষের মনে সেরকমই

চিন্তাভাবনা আছে?'

খেয়াল করলাম, আমাকে ব্যঙ্গ করে "ভালোমানুষ" শব্দটা উচ্চারণ করল সে। মেজাজ বিগড়ে গেল আমার, উল্টোসিধা কিছু একটা বলে ফেললাম। শুনে আরও ক্ষেপে গেল মন্টগোমারি, চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নামে যান! বার বার বলছি আপনার চেয়ে আমার অবস্থা অনেক খারাপ; বুঝেও বুঝতে পারছেন না, নাকি কানে যাচ্ছে না আমার কথা?' একলাফে উঠে দাঁড়াল সে, থাবা দিয়ে তুলে নিল ব্র্যান্ডির বোতলটা। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নিন, খান! খালি বড় বড় কথা! খান!'

'না,' কঠিন কণ্ঠে বললাম।

ল্যাম্পের হলুদ আলোয় মন্টগোমারিকে কেমন অচেনা মনে হলো আমার, যত মদ খাচ্ছে তত বকবকানি বাড়ছে ওর, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সে। পশুমানবদের পক্ষে কথা বলছে বার বার, শেষে গুণগান গাইতে শুরু করল ম্লিং-এর। বলল, এ-জীবনে কারও কাছ থেকে যদি সেবাযত্ন বলে কিছু পেয়ে থাকে, তাহলে নাকি ম্লিং-এর কাছ থেকেই পেয়েছে। তারপর হঠাৎ করেই কী যেন হয়ে গেল ওর। ব্র্যান্ডির বোতলটা আঁকড়ে ধরে টলতে টলতে দরজার দিকে এগোতে শুরু করল।

কী করতে যাচ্ছে সে বুঝে গেলাম। পথ রোধ করে দাঁড়ালাম ওর। 'ওই জন্তুটাকেও মদ খাওয়াবেন নাকি!'

'জন্তু? কে জন্তু? তুই জন্তু। সর্ আমার সামনে থেকে!'

'দোহাই লাগে...'

'সর্ বলছি!' গর্জে উঠে একটানে রিভলভার বের করল মন্টগোমারি।

'ঠিক আছে,' বলে সরে দাঁড়ালাম একপাশে। আমার ঘরের দরজাটা খোলার জন্য হুড়কোয় যখন হাত দিয়েছে সে, তখন

একবার মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ি ওর উপর। কিন্তু আমার ভাঙা হাতটার কথা ভেবে বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা।

সজোরে, সশব্দে দরজাটা খুলল মন্টগোমারি; তারপর আধপাক ঘুরে তাকাল আমার দিকে। ল্যাম্পের হলদেটে আলো আর চাঁদের ফেকাসে আলোয় ওকে দেখে আগের চেয়েও অন্যরকম মনে হলো আমার। ওর পাতলা ভ্রুর নীচে চক্ষুকোটরদুটো দেখে মনে হচ্ছে কালো দুটো গর্ত যেন।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমার উদ্দেশ্যে বলল সে, 'তোর ভেতরে মনুষ্যত্বের অহঙ্কার অনেক বেশি, শালা! নিকুচি করি তোর! আগামীকাল আত্মহত্যা করবো আমি, তবে তার আগে একটা রাত কাটাতে চাই একেবারে নিজের মতো করে—সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে।' ঘুরে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'ম্লিং! ম্লিং, বন্ধু আমার!'

চাঁদের মরা আলোয় অস্পষ্ট তিনটা ছায়ামূর্তিকে দেখলাম এগিয়ে আসছে সৈকত ধরে। এতদূর থেকেও একজনকে চিনতে পারলাম—মন্টগোমারির নৌকার এক বাদামি পশুমানব। পেছনের দু'জনকে ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না, চলমান কালো স্তূপ বলে মনে হচ্ছে। ম্লিং-এর কুঁজো কাঁধদুটো চোখে পড়ল কিছুক্ষণ পর। বাড়ির এক কোনা ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'নে, খা!' হাতে ধরা বোতলটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল মন্টগোমারি, 'এই শালা! জন্তু কোথাকার! খা! খেয়ে মানুষ হ!' হাতের বোতলটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ধীর কদমে পশ্চিমদিকে রওয়ানা হলো সে। ম্লিং আর অন্য তিন পশুমানব পিছু নিল ওর। চাঁদের আলোয় চকচক করছে সৈকতটা, ওটা ধরে পাঁচটা কালো মূর্তির মতো এগিয়ে চলল ওরা অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। মন্টগোমারিকে একবার দেখলাম নির্জলা ব্র্যান্ডি গেলাচ্ছে ম্লিংকে।

বাকিরাও বাদ যায়নি—আরও কিছুক্ষণ পর সৈকত থেকে ভেসে আসা হইচই আর হেঁড়ে গলার অর্থহীন টুকরো টুকরো “গান” শুনে বুঝলাম। মন্টগোমারি যা গাইতে বলছে, তা-ই গাইছে ওরা, গানের বেশিরভাগ কথাই আমাকে ব্যঙ্গ করে। সেনাদলের কুচকাওয়াজের মতো 'ডা-ই-নে ঘুর!' বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মন্টগোমারি, শুনে পুরো দলটা ওর পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেল দূরের কালো জঙ্গলটার ভিতরে। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল ওদের কোলাহলের সব আওয়াজ।

নীরবতা জমাট বাঁধল আবার। এতক্ষণে মধ্যাকাশ ছাড়িয়ে গেছে চাঁদ, ধীরগতিতে ঢলে পড়ছে পশ্চিমদিকে। বাড়ির দেয়ালের ছায়া গজখানেক চওড়া হয়ে পড়েছে মাটির উপর; কুচকুচে কালো এক অশরীরীর মতো এমনভাবে স্পর্শ করে আছে আমার পায়ের পাতা যে, টেরই পাচ্ছি না। পুবদিকে তাকালে চোখে পড়ে একটুখানি সমুদ্র; রাতের এই সময়ে, একাকিত্বের এই মুহূর্তে সাগরটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো আমার। ওই অবারিত জলরাশি আর মাটিতে লুটিয়ে পড়া এই ছায়ার মাঝখানে ধূসর বালির বিস্তার, হীরার মতো চকচক করছে সৈকতটা চাঁদের আলোয়। আমার পেছনে একটানা জ্বলতে জ্বলতে গরম আর লাল হয়ে উঠেছে কেরোসিন ল্যাম্পটা।

ঢুকে পড়লাম আমার ঘরে, দরজা আটকে দিলাম ভালোমতো। তারপর গিয়ে হাজির হলাম ডক্টর মরোর গবেষণাগারে। মৃত কতগুলো স্ট্যাগহাউন্ড আর লামার পাশে, লতাপাতার স্তূপের উপর পড়ে আছেন তিনি। দেখলে কে বলবে মারা গেছেন খুবই প্রতিভাবান এই বিজ্ঞানী? ভয়ঙ্কর একটা মৃত্যুর পরও আগের মতোই সৌম্য আছে বিশাল চেহারাটা, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কঠোর চোখদুটো। একটা সিল্কের

এককোনায় বসে পড়লাম। কী করা যায় ভাবছি। ডিঙি নৌকাটায় কিছু খাবারদাবার আর মালপত্র নিয়ে ভেসে পড়বো অজানার উদ্দেশে, তারপর কপালে যা লেখা আছে হবে। এই ভয়ঙ্কর দ্বীপে অসহায়ের মতো দিন কাটিয়ে শেষে একদিন পশুমানবদের শিকারে পরিণত হওয়ার ইচ্ছা নেই আমার। তবে যাওয়ার আগে কাল সকালেই পুড়িয়ে ছাই করতে হবে মরো আর হতভাগা এই জন্তুগুলোকে। মন্টগোমারির ব্যাপারে কোনো আশা নেই; সত্যি বলতে কী, বছরের পর বছর ধরে পশুমানবদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওর মানবীয় গুণগুলো লোপ পেতে শুরু করেছে, মানুষের সমাজে বসবাস করার যোগ্যতা বলতে গেলে হারিয়ে ফেলেছে বেচারা।

কতক্ষণ ধরে বসে বসে ওসব ভাবছিলাম জানি না। মন্টগোমারি ফিরে এসেছে—টের পাওয়ামাত্র আমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কারা যেন, শুনে মনে হলো পুরো দুনিয়াটাই জয় করে ফেলেছে ওরা বোধহয়; উল্লাস আর হুঙ্কারে ভারী হয়ে উঠল রাতের বাতাস, পানির কিনারায় এসে থেমে গেল ওদের হৈ-হুল্লোড়। হাতাহাতি আর ডালপালা ভাঙার আওয়াজ পেলাম কয়েকবার, কিন্তু পাত্তা দিলাম না তেমন একটা। তারপর শুরু হলো বেসুরো কিছু কণ্ঠের অসংলগ্ন কিছু "গান"।

কীভাবে পালানো যায় ভাবতে লাগলাম আবার। উঠে দাঁড়ালাম একসময়, ঘরে গিয়ে নিয়ে এলাম ল্যাম্পটা। উঠানের এককোনার একটা চালাঘরে ছোট কয়েকটা পিপা দেখেছিলাম একবার, সেগুলোর ভিতরে কী আছে জানার জন্য এগিয়ে গেলাম সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখি, বিস্কিটের কতগুলো টিন আছে ভিতরে। খুললাম একটা। ঠিক তক্ষুনই চোখের কোনায় একটা

নড়াচড়া ধরা পড়ল—মনে হলো লাল একটা অবয়ব দেখতে পেলাম যেন। পাঁই করে ঘুরলাম।

আমার পেছনে চাঁদের আলোয় প্রাণবন্ত উঠান। লতাপাতার যে-স্তূপের উপর শুয়ে আছেন মরো, সেটা দেখতে পাচ্ছি। তাঁর পাশে ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছে হতভাগা জন্তুগুলো, দেখে মনে হচ্ছে প্রতিশোধ-স্পৃহায় শেষবারের মতো নিজেদেরকে আঁকড়ে ধরেছে যেন। লালচে একটা আভা দেখতে পেলাম হঠাৎ—নাচতে নাচতে উল্টোদিকের দেয়ালে গিয়ে থামল আলোটা, তারপর দেয়ালের উপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মিট মিট করে জ্বলছে ল্যাম্পটা, ভাবলাম ওটারই আলো হবে সম্ভবত। ঘুরে আগের কাজে মন দিলাম আবার। একহাতেই তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম পিপাগুলো। আগামীকাল যাত্রার সময় যে-জিনিসটাই কাজে লাগবে বলে মনে হলো, সরিয়ে রাখতে লাগলাম একপাশে। ক্লান্ত শরীর আর ভাঙা একটা হাত নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে; তাই কাজের গতি হলো ধীর, কিন্তু সময় বয়ে গেল দ্রুত। কখন যে ভোরের প্রথম-আলো ফুটে উঠল আকাশে টেরই পেলাম না।

মরোর "দলের" সদস্যদের হইচই থেমে গিয়েছিল, রাত মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আবার। বাড়তে বাড়তে শেষপর্যন্ত হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। বার কয়েক শুনলাম 'আরও!' 'আরও!' বলে চেঁচাচ্ছে কারা যেন। কোলাহল এত বেড়ে গেল যে, নিজের কাজে মন বসাতে পারলাম না আর; কী হচ্ছে সৈকতে জানার ইচ্ছা জাগল মনে। উঠানটাতে বেরিয়ে এসে কান পাতলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে চমকে দিয়ে গর্জে উঠল একটা রিভলভার।

ছুটলাম সঙ্গে সঙ্গে। নিজের ঘরটা পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম

দরজার সামনে, তারপর দ্রুত হাতে দরজা খুলে বাইরে। দরজা যখন খুলছিলাম, মরোর ল্যাবরেটরির ভিতর থেকে ভেসে এল অদ্ভুত একটা শব্দ। শুনে মনে হলো উল্টে পড়েছে দুয়েকটা বাক্স, মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে কাচের কিছু জিনিস। কিন্তু ওসবের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না তখন, তাই বাইরে এসেই এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম।

সৈকতে, বোটহাউসের পাশে চলছে বহ্নুৎসব–ভোরের অস্পষ্ট আলোয় স্ফুলিঙ্গের অদ্ভুত এক বর্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আগুন ঘিরে ধস্তাধস্তি করছে কতগুলো কালো মূর্তি। আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম মন্টগোমারিকে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলাম সেদিকে, পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে হাতে নিয়েছি। একবার গুলি করল মন্টগোমারি, আগুনের ঝলকটা দেখতে পেলাম মাটির কাছে। তারমানে পড়ে গেছে বেচারা। যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, ফাঁকা গুলি করলাম একবার। পশুমানবদের কেউ তখন চিৎকার করে বলল, 'প্রভু! আমাদের প্রভু আসছেন!' ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ওরা, যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল, দপ করে একবার জ্বলে উঠেই স্তিমিত হয়ে গেল আগুনটা। মাথা গরম হয়ে গেছে আমার ততক্ষণে, তাই পলায়নরত পশুমানবদের দিকে রিভলভারটা তাক করে গুলি করলাম আরেকবার। লাভ হলো না কোনো, ঝোপঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা। কালো একটা স্তূপের মতো মাটিতে পড়ে আছে মন্টগোমারি, ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

চিত হয়ে আছে সে, ওর উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ধূসরচুলো পশুমানবটা। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই জন্তুটার শরীরে, কিন্তু তারপরও বাঁকা বাঁকা নখ দিয়ে খামচে ধরে আছে মন্টগোমারির গলা। পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে ম্লিং। কামড়ে

ওর ঘাড়টা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে কেউ, ভাঙা ব্র্যান্ডির বোতলের গলার কাছটা ধরে আছে বেচারা একহাতে। আরও দুই পশুমানব পড়ে আছে নিভু নিভু আগুনের পাশে—একজন নিস্পন্দ, আরেকজন গোঙাচ্ছে, থেকে থেকে মাথা তুলছে কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে।

ধূসরচুলোকে টেনে সরালাম মন্টগোমারির উপর থেকে। শয়তানটার বাঁকা বাঁকা বড় বড় নখগুলো ছাড়তে চায় না মন্টগোমারির ছেঁড়া কোট, জোর খাটাতে হলো আমাকে। কালো হয়ে গেছে কোটের মালিকের চেহারা। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কি না বুঝতে পারলাম না। সৈকতেই যেহেতু পড়ে আছে—সমুদ্র থেকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে এসে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম ওর চোখেমুখে। আমার কোটটা খুলে দলা পাকিয়ে বালিশের মতো বানালাম, ওটা দিলাম ওর মাথার নীচে। স্লিং-এর দিকে তাকালাম আরেকবার। কোনো সন্দেহ নেই মারা গেছে বেচারা। আগুনের পাশে চিৎপাত হয়ে আছে ধূসর চেহারার দাড়িওয়ালা এক নেকড়েমানব; এতক্ষণে খেয়াল করলাম ওটার ঊর্ধ্বাঙ্গ পড়ে আছে জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপর, কিন্তু বেচারা এত বেশি আহত যে, সরতেও পারছে না। গুলি করে ওটার খুলি উড়িয়ে দিয়ে ওটাকে রেহাই দিলাম সব যন্ত্রণা থেকে। আরেকটা পশুমানবও পড়ে আছে, একটুও নড়ছে না--বুঝলাম মারা গেছে এটাও।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম মন্টগোমারির পাশে। প্রাথমিক চিকিৎসার কিছুই জানি না বলে জীবনে প্রথমবারের মতো খুব আফসোস হলো আমার। আরও স্তিমিত হয়ে এসেছে আগুন, সরু কিছু ডালের ছাই-এর মাঝখানে অল্প কয়েক টুকরো কাঠ নিস্তেজভাবে জ্বলছে এখন। এসব কাঠ কোত্থেকে যোগাড় করল মন্টগোমারি ভেবে আশ্চর্য না-হয়ে পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যে

আরও ফর্সা আর নীলচে হয়ে উঠল আকাশটা, নিষ্প্রভ আর অস্পষ্ট হয়ে গেল ডুবন্ত চাঁদ। আরও কিছু সময় পর লালচে হয়ে উঠল পুবাকাশ।

হঠাৎ ধুপ্ করে শব্দ হলো কোথাও, সাপের মতো হিস হিস করে উঠল কিছু একটা; ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনে তাকিয়েই আর্তচিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সকালের আকাশ দূষিত করে দিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বের হচ্ছে ধোঁয়া, পুরো বাড়িটাকে গ্রাস করে নিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা। খড় দিয়ে ছাওয়া ছাদ পুড়ে ছাই হতে সময় লাগল না। আমার ঘরের দিকে তাকালাম। ভিতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, জানালা দিয়ে ফোয়ারার মতো ছিটকে বাইরে চলে আসছে দু'-একটা শিখা মাঝেমধ্যে।

কী হয়েছে বুঝতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে। আমি যখন ঘর থেকে বের হলাম, কিছু একটা উল্টে পড়েছিল–সেই "কিছু একটা" হচ্ছে ল্যাম্প। মন্টগোমারির ডাক শোনামাত্র তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বেখেয়ালে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি জিনিসটা।

অনেক বেড়ে গিয়েছে আগুন; এখন বাড়ির ভিতরে ঢোকাই অসম্ভব, কোনো কিছু উদ্ধার করা তো পরের কথা। অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আছে–মনে পড়ল হঠাৎ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানো যায় এই দ্বীপ ছেড়ে। নৌকা দুটো যেখানে বাঁধা ছিল সেদিকে তাকালাম। ধক করে উঠল বুকটা–একটা নৌকাও নেই। আমার পাশে, বালির উপর পড়ে আছে দুটো কুড়াল; বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ফালি করে কাটা কাঠ। তারমানে নৌকাদুটো টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে দিয়েছে মন্টগোমারি, যাতে আর কোনোদিনই সভ্য জগতে ফিরে যেতে না-পারি! সে কি আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার

জন্য করেছে কাজটা? কিন্তু ওর কী ক্ষতি করেছি আমি?

প্রচণ্ড একটা ক্রোধ জাগল মনে। আমার পায়ের কাছে অসহায়ের মতো পড়ে থাকা বোকা গাধাটার মাথা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে খুব। হঠাৎ করেই ওর হাতদুটো কাঁপতে শুরু করল; এত দুর্বলভঙ্গিতে যে, দেখে করুণা জাগল মনে, উধাও হয়ে গেল রাগ। কয়েকবার কাতরে উঠল সে, তারপর মিনিটখানেকের জন্য খুলল দু'চোখ। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম ওর পাশে, উঁচু করে ধরলাম ওর মাথাটা। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল, আবারও খুলল সে; নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সকালের আকাশটার দিকে, তারপর তাকাল আমার দিকে। এতক্ষণে পলক পড়ল বেচারার।

'দুঃখিত,' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর, আমার মনে হলো কিছু যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। অসহায়ের মতো একদিকে কাত হয়ে আছে ওর মাথাটা। ভাবলাম, পানি খেলে বোধহয় ভালো লাগবে ওর; কিন্তু হাতের কাছে না-আছে পানি না-আছে পানি নিয়ে আসার মতো কোনো পাত্র। টের পেলাম, আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসছে ওর শরীর। বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। ঝুঁকে পড়লাম ওর উপর, ওর শার্টের যে-জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে সেখান দিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। না, একটুও ধুকপুক করছে না হৃৎপিণ্ডটা। মরে গেছে মন্টগোমারি।

সূর্যের প্রথম কিরণমালায় বর্ণিল হয়ে গেছে আকাশ, সমুদ্রের ফেনিল স্রোতের মিছিলে সেই আলোর চোখ-ধাঁধানো প্রতিফলন। কুঁচকে গেছে মন্টগোমারির চেহারাটা, কিন্তু তারপরও সূর্যের আলোর প্রভাবে লালচে একটা আভা ফুটে আছে সেখানে।

আমার কোট দিয়ে বানানো বালিশটার উপর সাবধানে নামিয়ে রাখলাম ওর মাথাটা। উঠে দাঁড়ালাম তারপর। সামনে দিগন্ত-

বিস্তৃত চকচকে বিষণ্ণ সাগর, আর পিছনে নিস্তব্ধ কিন্তু বিভীষিকাময় এই দ্বীপ—পশুমানবে ভরা, যাদেরকে আপাতত দেখা না-গেলেও জানি আছে কোথাও না কোথাও। বাড়িটা জ্বলছে এখনও; পুড়ে ছাই হচ্ছে সব খাবারদাবার আর অস্ত্রশস্ত্র, পোড়ার বিশ্রী একটা শব্দ পাচ্ছি এত দূর থেকেও, হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা, এটা-সেটা ভেঙে পড়ছে একটু পর পর। ধোঁয়ার মোটা একটা রেখা এগিয়ে আসছে সৈকতের দিকে, আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে, গাছপালার মাথার উপর দিয়ে পশুমানবদের কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। নিস্পন্দ পড়ে থাকা পাঁচটা লাশের দিকে তাকালাম আরেকবার। ঠিক তখনই, ঘন এক ঝোপ সরিয়ে বের হয়ে এল তিন পশুমানব। তিনজনেরই পিঠ কুঁজো, বাইরের দিকে অদ্ভুতভঙ্গিতে বের হয়ে আছে মাথা, হাতগুলো শরীরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, চোখে কৌতূহলী কিন্তু শীতল দৃষ্টি।

বার কয়েক ইতস্তত করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল তিনজনই।

বিশ

তাকিয়ে আছি ওদের দিকে। কপালে কী আছে জানি না। লড়াই করে পারবো না ওদের বিরুদ্ধে, তাছাড়া লড়লেও আক্ষরিক অর্থেই লড়তে হবে একহাতে, কারণ আরেকটা হাত গেছে ভেঙে। পকেটে একটা রিভলভার আছে, কিন্তু ওটার দুটো চেম্বার ফাঁকা।

সৈকতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাঠের টুকরোগুলোর মধ্যে আছে দুটো কুড়াল। জোয়ার এসেছে সমুদ্রে, টের পাচ্ছি আমার পিছনে পানি বাড়ছে ধীরে ধীরে। এগিয়ে আসছে দানব তিনটা, আড়চোখে তাকালাম ওদের চেহারার দিকে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না ওরা, বোধহয় চোখে চোখ রাখার সাহস পাচ্ছে না। একটু পর পর নাক কুঁচকাচ্ছে ওরা, আমার পাশে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর গন্ধ নিচ্ছে। কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম আমি, নেকড়ে-মানবের শরীরের নীচ থেকে রক্তমাখা চাবুকটা বের করলাম, তারপর সপাং করে চালালাম বাতাসে। থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল পশুমানবরা।

'স্যালুট করো!' কড়া গলার হুকুম করলাম, 'মাথা নোয়াও!'

ইতস্তত করতে লাগল ওরা। হাঁটু বাঁকাল একজন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার, তারপরও ওদের দিকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে আদেশ করলাম আবার। এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল একজন, ওর দেখাদেখি বাকিরাও। ওদের উপর থেকে চোখ না-সরিয়ে ঘুরলাম, এগিয়ে গেলাম মৃতদেহগুলোর দিকে। বললাম, 'এই লাশগুলো দেখতে পাচ্ছ? আইন মানেনি এরা কেউই। কাজেই উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে। মনে রেখো, আইনের চেয়ে বড় কিছু নেই এই দ্বীপে।'

'কেউ বাঁচতে পারবে না,' আধখোলা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল একজন পশুমানব।

'ঠিক, কেউ বাঁচতে পারবে না,' সম্মতি জানালাম। 'কাজেই আমি যা বলি কান খুলে শোনো আর ঠিক সেটাই করো।'

উঠে দাঁড়াল ওরা তিনজনই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে একজন আরেকজনের দিকে।

কুড়ালদুটো তুলে নিলাম। ভাঙা হাতটার স্লিং থেকে ঝুলিয়ে

দিলাম ওদুটোর মাথা। তারপর যথেষ্ট কসরত করে উপুড় করলাম মন্টগোমারির লাশ। ওর রিভলভারটা তুলে নিলাম বালির উপর থেকে। দুটো চেম্বারে গুলি আছে এখনও। ঝুঁকে পড়লাম আবার, তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কিছুক্ষণ, মন্টগোমারির পকেটে পেয়ে গেলাম ছ'টা বুলেট।

উঠে দাঁড়ালাম, চাবুক দিয়ে ওর লাশটার দিকে ইঙ্গিত করে আদেশ করলাম পশুমানবদের, 'ধরো ওকে। সাবধানে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দাও সমুদ্রে।'

এগিয়ে এল তিন পশুমানব। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখনও মন্টগোমারিকে ভয় পাচ্ছে ওরা। কিন্তু আমার হাতের চাবুক ওদের জন্য আরও ভয়ঙ্কর কিছু; সুতরাং কিছুক্ষণ ইতস্তত করে, নিতান্ত অনিচ্ছুকভঙ্গিতে হাত লাগাল ওরা। বাতাসে কয়েকবার চাবুক চালাতে হলো আমাকে, হুমকি-ধমকি দিতে হলো। অবশেষে খুব সাবধানে মন্টগোমারিকে তুলে নিল ওরা, তারপর এগিয়ে গেল সাগরের দিকে। এমনিতেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছিল পানির, ওদের অনিয়মিত পদক্ষেপে সে-আওয়াজ আরও বিশৃঙ্খল হলো যেন।

'যাও!' হুকুম করলাম, 'আরও সামনে যাও! দূরে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দাও ওকে।'

কোমর, তারপর একসময় বগল পর্যন্ত ডুবে গেল পশুমানবদের। আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে রইল ওরা। কী করবে জানতে চাইছে বোধহয়।

'ছেড়ে দাও,' বললাম আমি।

হাত থেকে লাশটা ছেড়ে দিল ওরা। ঝপাৎ করে আওয়াজ হলো, মুহূর্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য উধাও হয়ে গেল মন্টগোমারি। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আমার।

'ভালো!' ভাঙাকণ্ঠে বললাম।

তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসতে লাগল তিন পশুমানব। দেখে মনে হলো ভয় পেয়েছে। রূপালী পানিতে ওদের কালো ফেনরেখা কেমন বেমানান দেখাচ্ছে। তীরে এসে থামল ওরা, ঘুরে তাকিয়ে থাকল সাগরের দিকে। বোধহয় আশঙ্কা করছে এখনই পানি থেকে উঠবে মন্টগোমারি, প্রতিশোধ নেবে ওদের উপর।

'এবার এগুলো,' পিছন থেকে ডাকলাম ওদেরকে, হাতের ইশারায় অন্য লাশগুলো দেখিয়ে দিলাম।

আদেশ মানল ওরা। কিন্তু মন্টগোমারির লাশটা যেখানে ফেলেছে, সে-জায়গার ধারেকাছেও গেল না। তেরছাভাবে সরে গেল অনেকখানি, পানি ভেঙে যথেষ্ট কষ্ট করে এগোল প্রায় একশ' গজ, তারপর ভাসিয়ে দিল সবগুলো লাশ।

ম্লিং-এর লাশটা যখন ভাসিয়ে দিচ্ছে ওরা, তখন শুনতে পেলাম পা টিপে আমার দিকে এগিয়ে আসছে কে যেন। পাঁই করে ঘুরলাম। বিশাল হায়েনা-শূকর মানব দাঁড়িয়ে আছে বড়জোর বারো গজ দূরে। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে ওর, জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আমার উপর স্থির, শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত। আমাকে ঘুরতে দেখে থামল সে, চোখ সরিয়ে নিল আমার উপর থেকে।

একটা মুহূর্ত, মাত্র একটা মুহূর্ত ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে চাবুক ফেলে দিয়ে পকেট থেকে বের করলাম রিভলভার। নিজেকে বাঁচতে হলে এই জন্তুটাকে মারতেই হবে। এই দ্বীপে এখন এটার চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো পশুমানব আর নেই।

উত্তেজনাকর কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। চেঁচিয়ে উঠলাম হঠাৎ, 'স্যালুট করো! মাথা নোয়াও!'

জবাবে দাঁত বের করে ক্রুদ্ধ একটা হুঙ্কার ছাড়ল জন্তুটা। তারপর বলল, 'আপনি কে? আপনাকে কেন...'

আর দেরি করলাম না, রিভলভারটা তাক করেই গুলি করলাম। তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, ঘুরে দৌড় দিল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মিস্ করেছি আমি, গুলি লাগাতে পারিনি জন্তুটার গায়ে, আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছুটে পালাচ্ছে ওটা। পালাতে দিলে কী হতে পারে জানা আছে আমার, তাই আবার গুলি করার জন্য বুড়ো আঙুল দিয়ে কক করলাম রিভলভার। কিন্তু মাথা নিচু করে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়াচ্ছে জন্তুটা, এতদূর থেকে গুলি করে যদি লাগাতে না-পারি ভেবে বুলেট নষ্ট করার সাহস হলো না আমার। সৈকত বরাবর আড়াআড়িভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে বেশ কয়েকবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল সে, তারপর একসময় উধাও হয়ে গেল ঘন ধোঁয়ার আড়ালে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। তারপর নজর দিলাম পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা তিন পশুমানবের উপর। গত কয়েকটা মুহূর্তে যা যা ঘটেছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা, তাই স্লিং-এর লাশ পানিতে না-ফেলে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ওদেরকে কাজ শেষ করার ইঙ্গিত করে এগিয়ে গেলাম সৈকতের যে-জায়গায় লাশগুলো পড়েছিল সেদিকে। লাথি দিয়ে বালি সরিয়ে ঢেকে দিতে লাগলাম রক্তের বাদামি দাগগুলো।

পানি থেকে উঠে এল পশুমানবরা। ওদেরকে সঙ্গে রাখলে কী লাভ হবে, অথবা আদৌ কোনো লাভ হবে কি না বুঝতে পারলাম না; তাই চলে যেতে বললাম। তারপর সৈকত পার হয়ে গিয়ে ঢুকলাম জঙ্গলে। ভাঙা হাতের স্লিং-এ কুড়ালদুটোর সঙ্গে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছি চাবুকটা, আরেক হাতে নিয়েছি রিভলভার। কপালে কী আছে ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই দ্বীপে এখন এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি কিংবা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি কয়েক ঘণ্টা।

কী করা উচিত বুঝতে না-পেরে ফিরে এলাম সৈকতে। পুবমুখী হয়ে হাঁটতে লাগলাম। জ্বলন্ত বাড়িটা ছাড়িয়ে এগোলাম কিছুদূর। এ-জায়গার বালিতে জায়গায় জায়গায় কেমন একটা লালচে আভা, অনতিদূরে একটা শৈলশিরা। সুবিধাজনক একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে। মাথার উপরে আগুন ঢালছে সূর্য, যতই সময় যাচ্ছে ততই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি। যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম পুরো ব্যাপারটা, কিন্তু লাভ হলো না—আকাশ-পাতাল ভাবনা পেয়ে বসল আমাকে।

কতক্ষণ পর জানি না, সামুদ্রিক কিছু পাখির চিৎকারে ব্যাঘাত ঘটল আমার চিন্তায়। তাকিয়ে দেখি, স্রোতের ধাক্কায় সৈকতে এসে ঠেকেছে কালো একটা বস্তু, আর ওটা নিয়েই হুটোপুটি করছে পাখিরা। কালো জিনিসটা কী জানি আমি, কিন্তু পাখিগুলোকে তাড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে জাগছে না মনে। উঠে দাঁড়ালাম, উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম। সরে যাচ্ছি আরও পুবদিকে, একটু একটু করে কাছিয়ে আসছে সঙ্কীর্ণ ওই উপত্যকা, যেখানে আছে পশুমানবদের "গ্রাম"। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি আশপাশের ঘন-হয়ে-জন্মানো গাছপালা, কারণ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য ওত পেতে থাকতে পারে যে-কেউ।

আধমাইল মতো চলার পর হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম, আমার পিছু নিয়েছে কেউ। ঘুরে তাকালাম সঙ্গে সঙ্গে। যে তিনজন পশুমানব ছিল আমার সঙ্গে, ওদেরই একজন। কিন্তু আমি এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছি যে, ওকে চেনার পরও হাতের রিভলভার তাক করলাম ওর দিকে। শান্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল জন্তুটা, আমাকে আক্রমণ করার মতো লক্ষণ

ছিল না ওর হাবভাবে, তারপরও উত্তেজিত না-হয়ে পারলাম না। আমাকে রিভলভার তুলতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে, ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর আগের চেয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল।

'চলে যাও!' চিৎকার করে উঠলাম।

মনিবের প্রতি যেমন অনুরক্তি দেখায় কুকুর, ওই পশুমানবটার আচরণেও সেরকম কিছু একটা আছে বলে মনে হলো আমার। তাড়িয়ে দেয়া কুকুরের মতোই ধীরগতিতে পিছু হটল সে, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই থেমে দাঁড়াল। কুকুরের মতোই কাতর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'চলে যাও,' আবার বললাম, 'আমার কাছে এসো না।'

'আমি কি আপনার কাছে আসতে পারি না?' করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জন্তুটা।

'না। চলে যাও,' জোর গলায় বললাম। চাবুক বের করে চালালাম বাতাসে। তারপরও জন্তুটা যাচ্ছে না দেখে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলাম চাবুক, নিচু হয়ে তুলে নিলাম একটা পাথর। হাত তুলে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলাম। কাজ হলো—আস্তে আস্তে চলে গেল জন্তুটা।

আবার হাঁটতে লাগলাম আমি। একসময় হাজির হলাম পশুমানবদের উপত্যকায়। নলখাগড়া আর আগাছার জঙ্গলটা সমুদ্র থেকে আড়াল করে রেখেছে এ-জায়গাকে, ওই জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগলাম কী করছে জন্তুগুলো। মরো বা মন্টগোমারির মৃত্যুসংবাদে কিংবা "বেদনা-নিবাস"-এর পুড়ে যাওয়ার খবরে ওদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছি ওদের ভাবভঙ্গি আর কাজকর্ম দেখে। কিছুক্ষণ দেখার পর মনে হলো, আগের মতোই স্বাভাবিক আছে ওরা, উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। নিজের

নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপরই রাগ হলো। সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম, ধৈর্য ধরতে পারিনি; এমনকী মন্টগোমারির চির-বিদায়ের পর যখন সুযোগ ছিল এই পশুমানবদের শাসক হয়ে যাওয়ার, তখন আকাশ-পাতাল ভেবে আর একা একা ঘুরে সময় নষ্ট করেছি।

দুপুর পর্যন্ত বসেই থাকলাম এক জায়গায়। দূরে আসছে-যাচ্ছে পশুমানবরা, মাটিতে আরাম করে শুয়ে-বসে রোদ পোহাচ্ছে। আমার খিদা আর পিপাসা এত বেড়ে গেছে যে, বাঁচবো না মরবো সে-আতঙ্কও কমে গেছে অনেকখানি। অবশেষে পারলাম না আর, হাতে রিভলভার নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঝোপের আড়াল থেকে। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি অনতিদূরে বসে থাকা কয়েকটা পশুমানবের দিকে।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল একটা নেকড়ে-মানবী। একদৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকল আমার দিকে। ওর দেখাদেখি বাকিরাও। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে না কেউ, সম্মানও জানাচ্ছে না আমাকে। এত কাহিল লাগছে আমার যে, হুকুম করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ, দেখি কী হয়।

কিছুই হলো না। আমি দেখছি ওদেরকে, ওরা দেখছে আমাকে। একসময় নীরবতা ভাঙতে হলো আমাকেই, অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বললাম, 'কিছু খেতে দাও।'

আমার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অলস কণ্ঠে বলল এক ষাঁড়-শূকর মানব, 'ঘরের ভিতরে খাবার আছে।'

ওদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। বেশিরভাগ ঘরই খালি। পুরো জায়গাটা এই ভরদুপুরেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। অদ্ভুত একটা গন্ধ বাতাসে। বুকের

ভিতরটা কেঁপে উঠল আমার।

খালি একটা কুঁড়েঘরের ভিতরে পেয়ে গেলাম দাগি আর প্রায়-পচা কয়েকটা ফল। খেয়ে নিলাম সেগুলো। তারপর বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনলাম কিছু লাকড়ি। কুঁড়ের ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা, লাকড়িগুলো দিয়ে ঠেস দিয়ে রাখলাম যাতে বাইরে থেকে সহজেই খুলতে না-পারে কেউ। দরজার দিকে মুখ দিয়ে বসে পড়লাম দেয়াল ঘেঁষে, রিভলভার হাতে নিয়ে। গত ত্রিশ ঘণ্টার ক্লান্তি পেয়ে বসল আমাকে, কখন যেন ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ।

একুশ

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার সময়। ভাঙা হাতটা ব্যথা করছে। উঠে বসলাম, কোথায় আছি ঠাওর করতে পারলাম না প্রথমে। কুঁড়ের বাইরে অস্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলছে কারা যেন। দরজার দিকে তাকানোমাত্র ধক করে উঠল বুকের ভিতরে। স্পষ্ট মনে আছে লাকড়ি দিয়ে ঠেস দিয়ে রেখেছিলাম, এখন দেখছি সবগুলো লাকড়ি উধাও। খুলে হাঁ হয়ে আছে দরজাটা। তবে রিভলভারটা এখনও আমার হাতেই আছে।

টের পেলাম, আমার পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে আছে কী যেন। এত কাছে যে, ওটার নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে এল আমার, জিনিসটা কী দেখার জন্য ঘাড়

ঘুরালাম। ধীরে, খুব ধীরে নড়ে উঠল ওটা। নরম, উষ্ণ আর ভেজা ভেজা কিছু একটার স্পর্শ পেলাম আমার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীর শক্ত হয়ে গেল আমার। একটানে ছাড়িয়ে নিলাম হাতটা। চেঁচানোর জন্য মুখ খুললাম, কিন্তু গলার ভিতরেই আটকে গেল আওয়াজটা। রিভলভার তাক করলাম জিনিসটার দিকে, তারপর কোনোরকমে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস্ করলাম, 'কে?'

'আমি, প্রভু।'

'তুমি কে?'

'ওরা বলে এখন নাকি আমাদের কোনো প্রভু নেই। কিন্তু আমি জানি আছে। আপনি যাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের লাশগুলো সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। প্রভু, আমি আপনার দাস।'

'তোমার সঙ্গে কি সৈকতেই দেখা হয়েছিল?'

'জী।'

সাহস কিছুটা ফিরে পেলাম। হাত বাড়িয়ে দিলাম; আমার ঘুম ভাঙামাত্র যেভাবে "চুমু" খেয়েছিল জন্তুটা, সেভাবে চুমু দিল আবার। তবে মনে হলো ঠোঁট নয়, জিহ্বার স্পর্শ পেয়েছি যেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাকিরা কোথায়?'

'ওরা সবাই পাগল, সবাই বোকা। ওরা বলে, "প্রভু মরে গেছেন। যাঁর কাছে চাবুক থাকত তিনিও মরে গেছেন। সাগর থেকে যিনি এসেছেন তিনি আমাদের মতোই। আমাদের এখন কোনো প্রভু নেই, শাসন করার কেউ নেই, বেদনা-নিবাসও নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। আইন ভালোবাসি আমরা, তাই মেনে চলবো, কিন্তু আমাদেরকে আর কখনও শাস্তি পেতে হবে না।"'

যেন সন্তুষ্ট হয়েছি, এমনভাবে হাত দিয়ে কয়েকবার মৃদু

চাপড় দিলাম জন্তুটার মাথায়। মনে পড়ল এতক্ষণে, সৈকতে যে তিন পশুমানবকে দেখেছিলাম, এটা ওদেরই একজন—কুকুর-মানব।

'আপনি কি ওদের সবাইকে শাস্তি দেবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেবো। যারা আমার কথা শুনবে না তাদের সবাইকে কয়েকদিনের মধ্যেই কঠিন শাস্তি দেবো আমি।'

'প্রভু যাকে ইচ্ছা করেন হত্যা করতে পারেন।'

'তোমাদের মধ্যে একজন খুব গুরুতর একটা অন্যায় করেছে। সুযোগ পেলেই ওকে হত্যা করা হবে। যদি কখনও দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে, আমি বলামাত্র লাফিয়ে পড়বে ওর উপর। চলো এখন, বাইরে যারা আছে ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

আমার আগে বাইরে বের হলো কুকুর-মানব। যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিন শুনেছিলাম আমাকে ধাওয়া করে আসছিল ডক্টর মরোর হাউন্ডগুলো, সে-জায়গার কাছাকাছি দাঁড়ালাম আমি। আঁধারে ঢেকে গেছে পুরো উপত্যকা, কেমন একটা ভেজা ভেজা দুর্গন্ধ বাতাসে। পিছনে, কালচে সবুজ ঢালে, জ্বলছে আগুন; সেটার আশপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে কুঁজোপিঠের কিম্ভূতকিমাকার কতগুলো অবয়ব। দূরে ঘন গাছপালার কালো জঙ্গল। চাঁদ উঠছে, দ্বীপের ধূমরন্ধ্রগুলো থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার রেখায় কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে সেটা।

'এসো আমার সঙ্গে,' কুকুর-মানবকে কথাটা বলেই হাঁটা ধরলাম। দু'-একটা কুঁড়ে থেকে একজন-দু'জন পশুমানব বের হয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে আমাকে, কিন্তু তেমন একটা পাত্তা দিলাম না ওদেরকে।

আগুনের আশপাশে থাকা পশুমানবদের কেউই সম্মান জানাল

না আমাকে। আমাকে অবহেলা করছে ওরা। হায়েনা-শূকর মানবের খোঁজে তাকালাম এদিক-ওদিক, কিন্তু দেখতে পেলাম না ওকে। সব মিলিয়ে বিশজনের মতো পশুমানব আছে এখানে; কেউ চুপচাপ তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে, আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কেউ কেউ।

'তিনি মরে গেছেন, তিনি মরে গেছেন! আমাদের প্রভু মরে গেছেন!' পাশ থেকে হঠাৎ কিচিরমিচির করে উঠল বানর-মানব। 'বেদনা-নিবাস বলেও কিছু নেই এখন।'

উঁচু কণ্ঠে বললাম, 'তিনি মরেননি। তিনি এখনও আমাদেরকে দেখছেন!'

কথাটা শুনে থমকে গেল ওরা। বিশ জোড়া চোখ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

'বেদনা-নিবাস নেই, কিন্তু আবার আসবে। তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পারো না, তিনি কিন্তু ঠিকই তোমাদের কথা শুনছেন।'

'ঠিক, ঠিক!' আমার সঙ্গে তাল মেলাল কুকুর-মানব।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছে পশুমানবরা। আসলে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই ওদের, তাই যখন যেটা সত্য বলে ভাবে ওরা, কেউ সেটার বিপক্ষে কিছু বললে প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রতিবাদ করার মতো কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না আসলে। পশুরা যত ভয়ঙ্কর আর ধূর্তই হোক না কেন, ওদের মধ্যে বোধহয় মিথ্যা জিনিসটা নেই; একমাত্র মানুষই পারে মিথ্যা কথা বলতে অথবা মিথ্যা কাজ করতে।

'এই মানুষটা অদ্ভুত কথা বলছে,' বলল একজন পশুমানব।

'কিন্তু যা বলছি ঠিকই বলছি,' বললাম আমি। 'প্রভু আর তাঁর

বেদনা-নিবাস আবার ফিরে আসবে। তোমাদের মধ্যে যারা আইন মেনে চলবে না, সেদিন তাদেরকে ভুগতে হবে।'

একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে পশুমানবরা। উদাসীনতার ভান করে নিতান্ত অলস ভঙ্গিতে হাতের কুড়াল দিয়ে কোপ দিতে লাগলাম মাটিতে। খেয়াল করলাম, নিজেদের মধ্যে ফিসফিসানি বন্ধ রেখে এখন আমাকেই দেখছে ওরা।

আমাকে প্রশ্ন করে চলল ওরা, ধৈর্য ধরে মিথ্যা বলতে লাগলাম একের পর এক। তবে মিথ্যাগুলো এমনভাবে বললাম যাতে একটার সঙ্গে আরেকটার মিল থাকে। যত কথা বলছি জড়তা তত কেটে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি আমার কথার প্রভাব পড়ছে পশুমানবদের উপর। ঘণ্টাখানেক পর বুঝতে পারলাম, বেশ কয়েকজন পশুমানব বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, আবার ফিরে আসবেন মরো। নিজেদের মধ্যে আবারও কথা বলতে শুরু করেছে ওরা, প্রসঙ্গ একটাই—মরোর পুনরুত্থান।

আপাতত আমার আর কিছু বলার নেই বুঝতে পেরে তাকালাম এদিক-ওদিক। আমার "শত্রু" হায়েনা-শূকরকে খুঁজছি আসলে। কিন্তু দেখা নেই জন্তুটার। পশুমানবদের সঙ্গে আলোচনার শুরুতে আশপাশে কোনো নড়াচড়া টের পেলেই চমকে চমকে উঠছিলাম, এখন অনেকখানি কেটে গেছে ভয়টা।

আরও উপরে উঠে এসেছে চাঁদ। পশুমানবরা একে একে হাই তুলছে ক্রমাগত। কিছুক্ষণ পর একজন একজন করে এগোতে লাগল কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। বুঝতে পারছি দ্বীপে একা একা ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এদের সঙ্গে থাকলেই আমার উপকার বেশি, সুতরাং আমিও ফিরে এলাম আমার কুঁড়েতে।

সে-রাত থেকে পশুমানবদের সঙ্গে একাকী জীবন যাপন করতে লাগলাম। একাকী বলছি কারণ, মানুষ বলতে আমি ছাড়া

কেউ নেই দ্বীপে। যারা আছে তারা না মানুষ, না পশু। কথা বলতে পারে, কিন্তু সেসব কথা যতটা না ওদের মনের, তারচেয়ে বেশি ডক্টর মরোর–তিনি যেটা যেভাবে শিখিয়েছেন ওরা সেটা সেভাবেই বলে বেশিরভাগ সময়। খায়, ঘুমায়, সবই করে; কিন্তু ওদের কাজ দেখলে করুণা জাগে মনে–বেচারারা না পারল পশু হয়ে থাকতে, না পারল মানুষ হয়ে মরতে। করুণা জাগে নিজের উপরও–এমন এক জায়গায় পড়ে আছি যেখান থেকে কবে উদ্ধার পাবো, অথবা আদৌ উদ্ধার পাবো কি না জানি না।

সময় যায়। টুকরো টুকরো অসংখ্য ঘটনা ঘটে প্রায়ই, কিন্তু সেসব বলার মতো নয়। যেহেতু একসঙ্গে থাকি-খাই, আস্তে আস্তে আমাকে আপন করে নিল পশুমানবরা। সম্মান করে, আমার কথা শোনে, কিন্তু ঝগড়া বেধে গেলে এমনকী কামড়ও বসিয়ে দেয় আমার গায়ে। আমিও ছাড়ি না তখন, পাথর ছুঁড়ে মারি কিংবা কুড়ালের কোপ দেই। তাছাড়া কুকুর-মানব তো আছেই, প্রভুভক্তের মতো সবসময় থাকে আমার সঙ্গে।

হায়েনা-শূকর মানব এড়িয়ে চলে আমাকে। সে যাতে কোনো সুযোগ না-পায় সে-ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকার চেষ্টা করি আমি। কুকুর-মানব ঘৃণা করে ওকে, আবার ভয়ও পায়। আমার মনে হয় চিতাবাঘ-মানবের মতো রক্তের স্বাদ নিয়েছে সে-ও এবং সেজন্যই হিংস্র হয়ে গেছে। বনের ভিতরে কোনো একটা গুহায় একাই থাকে সে সম্ভবত। ওকে ধরার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে বললাম একবার পশুমানবদের, কিন্তু সাড়া দিল না ওরা কেন যেন। কুকুর-মানবকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই হানা দিয়ে বেড়াতে লাগলাম আমি জঙ্গলের ভিতরে এ-গুহায় সে-গুহায়, কিন্তু লাভ হলো না কোনো–বারবার কীভাবে যেন টের পেয়ে যায় শয়তানটা, পালিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা মাস। পশুমানবদের সঙ্গে আরও সহজ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার। দু'-একজনের সঙ্গে তো রীতিমতো খাতির হয়ে গেছে বলা যায়। শুয়োরের মতো দেখতে ছোট্ট গোলাপি জন্তুটা প্রায়ই আসে আমার কাছে, আমি যা করি তার প্রায় সবই অনুকরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বানর-মানবকে দেখলে বিরক্তি লাগে আমার। কথা বেশি বলে সে। আর নিজের হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে প্রায়ই অন্যদের বলে, সে আর আমি নাকি একই জাতের।

"আইন" মেনে চলে পশুমানবরা, অন্তত আমি দেখি ওদেরকে আইন মেনে চলতে। আবার মাঝেমধ্যে একটা-দুটো খরগোসের মৃতদেহও পাওয়া যায়—কেউ, আমার বিশ্বাস হায়েনা-শূকর খায় ওগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম, সম্ভবত মে মাসের দিকে—পশুমানবদের কথাবার্তা আর দেহভঙ্গিমায় স্পষ্ট একটা পরিবর্তন আসছে। আগে যেসব শব্দ সহজেই উচ্চারণ করতে পারত ওরা, এখন সেগুলো উচ্চারণ করতে গেলে কেমন আটকে আটকে যায় প্রায় সবারই। এমনকী একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাও বলতে চায় না সহজে। এক বানর-মানবই শুধু বকবক করে সারাক্ষণ, কিন্তু ওর কথার বেশিরভাগই বোঝা যায় না, বানরদের কিচিরমিচিরের মতোই মনে হয়। কেউ কেউ আবার কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে একেবারেই, কিন্তু আমি কিছু বললে বুঝতে অসুবিধা হয় না ওদের। সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না ওরা আজকাল, কষ্ট হয়। কাউকে কাউকে প্রায়ই দেখি চার হাতপায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে। আমাকে দেখামাত্র লজ্জিত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কোনো কিছু হাতে নিলে মনে হয় এখনই ফেলে দেবে—ঠিকমতো ধরে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। কামড়ে

কামড়ে, দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে খায় খাবার, পানি খায় নদীতে মুখ ডুবিয়ে। বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠে আমার, মনে মনে বলি, 'কোনো লাভ হলো না, ডক্টর মরো। মানুষ হয়ে থাকতে পারল না আপনার পশুরা। আবার আগের মতো হয়ে যাচ্ছে সবাই। বেশি দিন বাকি নেই।'

একটা জিনিস লক্ষ করে আশ্চর্য হলাম—পরিবর্তনগুলো যাদের মধ্যে এসেছে সবার আগে, তাদের বেশিরভাগই পশুমানবী। পশুমানবদের চেয়েও উন্মত্ত হয়ে উঠছে ওরা দিন দিন। একবিবাহের নিয়ম প্রচলিত থাকার পরও একাধিক পশুমানবের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের চেষ্টা করে ওরা, তা-ও আবার সবার সামনে। "আইন" বলতে যে কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকবে না দ্বীপে কয়েকদিন পর, সেটা আমার জায়গায় কোনো কানা-কালা থাকলেও বুঝত।

আমার কুকুর-মানবের অবস্থাও ভালো নয়। স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন প্রথম কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে, মোটামুটি পরিষ্কার উচ্চারণে গুছিয়ে কথা বলেছিল সে। কিন্তু এখন বলতে গেলে বোবা হয়ে গেছে জন্তুটা। যত দিন যাচ্ছে কথা বলার ক্ষমতা তত হারাচ্ছে সে। পরিবর্তন এসেছে ওর শরীরেও, বড় বড় লোম গজিয়ে গেছে সব জায়গায়। আগে ছিল বিশ্বস্ত এক সহচরের মতো, আর এখন কুকুরের সঙ্গে তেমন কোনো পার্থক্য নেই ওর।

দিন দিন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছিল ওই উপত্যকা আমার জন্য, তাই একদিন জায়গাটা ছেড়ে চলেই এলাম। ডক্টর মরোর বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ভিতরে ডালপালা দিয়ে কোনোরকমে বানিয়ে নিলাম একটা চালাঘর। ততদিনে "মনুষ্যত্ব" বলতে প্রায় কিছুই বাকি নেই পশুমানবদের মধ্যে। কাপড় তো দূরের কথা একটুকরো সুতো পর্যন্ত থাকে না কারও শরীরে

লোমে ঢাকা পড়ে গেছে সবার দেহ, সরু হয়ে সামনের দিকে বেরিয়ে এসেছে মুখ। একদিন নিজেদের মধ্যেই মারামারি-কামড়াকামড়ি শুরু করে দেবে ওরা, আমাকে উপাদেয় কোনো খাবার ভেবে নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ হয়তো। তবে এখনও সেরকম কিছু ঘটেনি। প্রায় প্রতিদিন পশুমানবদের উপত্যকায় যাই আমি, নিরাপদেই ফিরে আসতে পারি। রাত হয়ে গেলে একসময়ের "কুকুর-মানব" আসে আমার পিছু পিছু, চালাঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায় আমাকে। কখনও কখনও বসে থাকে ঘরের বাইরে। তখন কয়েকটা ঘন্টা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি আমি। সুখের মতো দেখতে ছোট্ট গোলাপি জন্তুটা মুখচোরা হয়ে গেছে অনেক, আমাকে দেখলে লজ্জাই পায় বোধহয়, তাই আর আসে না আমার কাছে। একদিন দেখি, গাছের ডালে পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে আছে সে; তবমানে ফিরে গেছে আগের জীবনে।

আমার কথা শুনে কেউ যদি ভাবেন পশুমানবরা আগের মতো পশু হয়ে গেছে তাহলে ভুল হবে। চিড়িয়াখানা বা জঙ্গলের ভালুক, নেকড়ে, বাঘ, শূকর বা বানরের মতো শারীরিক গঠন নেই ওদের, পুরোপুরি হবেও না হয়তো কোনোদিন। "কাটাকুটি" করে ওদের কাঠামো পাল্টে দিয়েছেন ডক্টর মরো—কারও বেশি কারও কম। কেউ দেখতে ভালুকের মতো কিন্তু ভালুক নয়, কেউ দেখতে বিড়াল-গোত্রের প্রাণীদের মতো কিন্তু বাঘ বা চিতাবাঘ নয়, কেউ দেখতে গবাদি পশুদের মতো কিন্তু গরু-মহিষ নয়। পশুত্ব ফিরে পেয়েছে ওরা, পশুর শরীরটা পায়নি।

পরিবর্তন হয়েছে আমারও। গায়ের কাপড়গুলোকে কাপড় না-বলে হলদেটে ন্যাকড়া বললে মানায় বেশি। রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেছে চামড়া। জট পাকিয়ে গেছে লম্বা লম্বা চুলে।

আজকাল প্রায় সারাদিন দ্বীপের দক্ষিণ-সৈকতে কাটিয়ে দেই আমি, বুকভরা আশা নিয়ে প্রার্থনা করতে থাকি একটা জাহাজের জন্য। ভাবি, অন্য কোনো জাহাজ না-হোক, অন্তত "আইপেকাকুয়ানহা" তো যাবে এখান দিয়েই। কিন্তু এল না জাহাজটা। পাঁচবার মাস্তুল আর তিনবার ধোঁয়া দেখলাম, কিন্তু দ্বীপের ধারেকাছেও এল না কেউ। দরকার হলে যাতে চট করে আগুন জ্বালানো যায় সেজন্য যোগাড়যন্ত্র করে রেখেছি আমি। কিন্তু এই আগ্নেয়দ্বীপের ধূমরন্ধ্র থেকে সবসময়ই ধোঁয়া বের হতে থাকে, তাই আমার জ্বালানো আগুন দেখে নাবিকরা কী বুঝবে কে জানে!

সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের দিকে ভাবতে শুরু করলাম একটা ভেলা বানানো যায় কি না। ততদিনে সেরে গেছে ভাঙা হাতটা, ভারী কাজ করতেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু ভেলার চিন্তাটা মাথায় আসার পর নিজের অসহায়ত্বের কথাটাও মনে পড়ে গেল আরেকবার। জীবনে কোনোদিন কাঠমিস্ত্রির কাজ বা ওই জাতীয় কিছু করিনি। তাই জঙ্গলে গাছ কেটে আর কাটা টুকরোগুলো কোনোরকমে জোড়া দিয়ে দিনের পর দিন কাটতে লাগল আমার। দড়ি বলতে কিছুই নেই, দড়ি বানিয়ে নেয়ার উপায়ও নেই। সরু ডাল আর শক্ত গুল্ম ব্যবহার করি; কিন্তু সেগুলো হয় সহজে বাঁকানো যায় না, না-হয় অল্পতেই ছিঁড়ে যায়। হাজার ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারি না। মনে আছে, বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ভিতরে আর সৈকতের যে-জায়গায় নৌকাদুটো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সেখানে আঁতিপাঁতি করে টানা প্রায় পনেরো দিন ধরে পেরেক বা ওই জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখেছিলাম। বিফলে যায়নি আমার পরিশ্রম, কিছু-না-কিছু হলেও পেয়েছি।

পশুমানবদের সঙ্গে দেখা হয় মাঝেমধ্যে। বলা ভালো, ওরা মাঝেমধ্যে দেখে কী করছি আমি। কাছে আসে না, ডাকলে লাফিয়ে চলে যায় আরেকদিকে। দিন-তারিখের হিসেব নেই আমার, তাই কখন বর্ষাকাল চলে এল বলতে পারবো না; ভারী বৃষ্টি আর বজ্রঝড় যথেষ্ট-ব্যাঘাত ঘটাল আমার কাজে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলাম না, একটু একটু করে কাজ চালিয়ে গেলাম এবং একটা ভেলা তৈরি করে ফেলতে পারলাম একদিন।

জিনিসটা দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমার ব্যবহারিক জ্ঞান কম, তাই সাগরে মাইলখানেক পাড়ি দিয়ে তীরে ফিরে আসার পর আপনাথেকেই খুলে আলাদা হয়ে গেল সবগুলো কাঠ। দিনের পর দিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বানানো একটা জিনিসের ওরকম দুর্দশা সহ্য করতে পারলাম না। ভেঙে পড়লাম একেবারেই, টানা কয়েক দিন শুয়ে থাকলাম সৈকতে, সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু ভাবলাম কবে মরণ হবে আমার।

মৃত্যুর কথা মুখে যতই বলুক, আসলে মরতে চায় না কেউই। আমিও না। একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যার কারণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য হলাম, বিষণ্ন আর অলসের মতো মূল্যবান কয়েকটা দিন নষ্ট করার জন্য মনে মনে ধিক্কার দিলাম নিজেকে। ভুলেই গিয়েছিলাম সময় যত যাচ্ছে পশুত্ব তত বেশি করে ফিরে আসছে পশুমানবদের ভিতরে।

আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে ডক্টর মরোর বাড়ির একদিকের দেয়াল, কিন্তু ভেঙে পড়েনি; ওটার ছায়ায় শুয়ে ছিলাম সেদিন। গোড়ালিতে শীতল কোনোকিছুর স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে চোখ খুললাম। স্লথের মতো দেখতে ছোট্ট গোলাপি জন্তুটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চোখ পিট পিট করছে। অনেকদিন

হলো কোনো কথা বলে না সে, হাঁটাচলাও করে খুব ধীরগতিতে। দিন দিন বড় আর ঘন হচ্ছে ওর গায়ের লোম, বেঁকে যাচ্ছে হাতের ছোট ছোট মোটা নখগুলো। আমাকে তাকাতে দেখে কাতরানোর মতো আওয়াজ করল সে। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে ঢুকল একটা ঝোপে, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে।

ব্যাপার কী বুঝলাম না প্রথমে। মনে হয় ওকে অনুসরণ করতে বলছে সে ইশারায়। উঠে বসলাম, তারপর ভালোমন্দ যা-ই থাক কপালে ভেবে পিছু নিলাম জন্তুটার। ওর গতি তো এমনিতেই মন্থর, আমিও তাড়াহুড়ো করলাম না। তাছাড়া আবহাওয়াও গরম।

জঙ্গলে পৌঁছানোমাত্র একটা গাছে চড়ে বসল জন্তুটা। মাটিতে হাঁটার চেয়ে ঝুলন্ত ডাল বেয়ে তাড়াতাড়ি এগোতে পারে সে। বেশ কিছুদূর গেলাম ওর পিছু পিছু। একটা জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সে, আমিও থমকে গেলাম বীভৎস দৃশ্যটা দেখে।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে এখানে। আমার "কুকুর-মানব" মরে পড়ে আছে মাটিতে। ওর একেবারে কাছে বসে আছে হায়েনা-শূকর। কুকুর-মানবের শরীর কাঁপছে এখনও, দু'হাতের কদাকার নখগুলো দিয়ে ওকে খামচে ধরে আছে হায়েনা-শূকরটা, সমানে কামড়াচ্ছে শরীরের এখানে-সেখানে, আর একটু পর পর হুঙ্কার ছাড়ছে বিজয়োল্লাসের। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকাল শয়তানটা। রাগে ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল ওর, বেরিয়ে পড়ল রক্তমাখা দাঁত; গর্জে উঠল সে ভয়ঙ্করভাবে।

বুঝতে বাকি রইল না আমার, "মনুষ্যত্ব" বলতে কিছুই নেই ওর ভিতরে। পুরোপুরি পশু হয়ে গেছে সে, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা বা ভয় কোনোটাই নেই ওর মনে। এক কদম

আগে বাড়লাম আমি, রিভলভার বের করলাম পকেট থেকে। দেখা যখন হয়েই গেছে, দেনা-পাওনার হিসেবটা চুকিয়ে ফেলা যাক।

পালানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না শয়তানটার মধ্যে। কক করলাম আমি, শব্দ শুনে পশুদের মতোই দু'কান সামনে-পিছনে করল সে, লোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, শরীর সঙ্কুচিত করল সে যেন এখনই লাফিয়ে পড়বে আমার উপর। তাড়াহুড়ো করলাম না, সময় নিয়ে নিশানা করলাম ওর দু'চোখের মাঝখানে, তারপর টেনে দিলাম ট্রিগার। ততক্ষণে লাফ দিয়ে ফেলেছে জন্তুটা, উড়ে এসে সোজা আমার উপর পড়ল সে। চিত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। আমাকে আঁকড়ে ধরল সে, কিন্তু জোর নেই ওর হাতে; কারণ এবার আর মিস্ করিনি আমি, জায়গামতোই লেগেছে বুলেট।

হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এলাম শয়তানটার শরীরের নীচ থেকে। উঠে দাঁড়ালাম। খেয়াল করলাম, কাঁপছি অল্প অল্প। লাশটাও কাঁপছে, কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে যাবে এই কম্পন, জীবনের সব লক্ষণ বিদায় নেবে ওই মৃতদেহ থেকে। বিপদ কেটে গেছে আপাতত; কিন্তু আমার মন বলছে আজ হোক বা কাল, এরকম ঘটনা আবারও ঘটবে।

কতগুলো লাকড়ি যোগাড় করে এনে চিতার মতো বানালাম, তারপর পুড়িয়ে দিলাম লাশদুটো। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই দ্বীপ ছেড়ে না-গেলে আমার মরণ সময়ের ব্যাপার মাত্র। দু'-একজন ছাড়া পশুমানবদের বেশিরভাগই চলে গেছে উপত্যকা ছেড়ে। ওদের কেউ থাকে গুহায়, কেউ ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে। দিনের বেলায় খাবার খোঁজে কেউ, কেউ আবার পড়ে পড়ে ঘুমায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। যে যার যার মতো আলাদা হয়ে গেছে ওরা। এই দ্বীপে

এখন কোনো আগন্তুক এলে বলবে, পাখি ছাড়া প্রাণী বলতে কিছু নেই এখানে। কিন্তু রাত নামলে পাল্টে যায় দ্বীপের পরিবেশ, অদ্ভুত একটা উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য টের পাই তখন—কেউ হুঙ্কার ছাড়ে, আবার কেউ কাতরায় মৃত্যুযন্ত্রণায়। মাঝেমধ্যে ভাবি, ধরে ধরে মেরে ফেলি সবগুলোকে। ফাঁদ বানানোর ফন্দি করি, মেজাজ বিগড়ে গেলে ছুরি নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে প্যারি না। তবে যথেষ্ট পরিমাণ বুলেট থাকলে দেরি করতাম না এতদিন—পশুমানব, বিশেষ করে বিশটার মতো যেসব মাংসাশী আছে তাদের দেখামাত্র গুলি করে মারতাম। আমার জন্য একমাত্র স্বস্তির কথা হলো, যে-মাংসাশীটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল সেটা মরেছে।

নামেমাত্র হলেও এতদিন আমার সঙ্গী ছিল এই কুকুর-মানব, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মরল সে-ও। ওর মৃত্যুর পর আগের চেয়ে আরও সতর্ক হতে হলো আমাকে। আজকাল দিনে ঘুমাই, রাতে জাগি। চালাঘর ছেড়ে সরে এসেছি বাড়ির পোড়া দেয়ালগুলোর ভিতরে। এমন একটা জায়গায় থাকি যেখানে ঢুকতে হলে সরু একটা প্রবেশপথ পার হয়ে আসতে হয়। আমাকে জানান না-দিয়ে আসতে পারবে না কেউই—কিছু-না-কিছু শব্দ হবেই। আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম, আগুনের ব্যবহার ভুলে গেছে পশুমানবরা, এখন বরং আগুন দেখলে ভয়ই পায় ওরা। কথাটা মাথায় রেখে আরেকটা ভেলা বানানোর কাজ শুরু করলাম—বাঁচতে হলে পালাতে হবে দ্বীপ ছেড়ে।

কাজ চলছে, এমন সময় একদিন হাতে চাঁদ পেলাম যেন। সাগরের দিকে তাকিয়ে একটা মাস্তুল দেখতে পেলাম দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে। দেখে মনে হলো একটা স্কুনার। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বেলে দিলাম আমি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, উত্তাপ

এসে লাগল আমার গায়ে, মাথার উপরে মাঝদুপুরের গনগনে সূর্য–কোনোকিছুকেই পাত্তা না-দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আগুনটার পাশে। সারাদিন একদৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকলাম দূরের ওই জাহাজটার দিকে; কিছু খেলাম না, এমনকী একঢোক পানি পর্যন্ত না। একসময় মাথা ঘুরাতে লাগল, মনে হলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না বেশিক্ষণ। সৈকতে এসে আমাকে অবাক বিস্ময়ে দেখল কয়েকজন পশুমানব কয়েকবার, তারপর চলে গেল। রাত নামল একসময়, অন্ধকারে হারিয়ে গেল জাহাজটা। বার বার নিভে যেতে চাচ্ছে আগুনটা, প্রাণান্ত চেষ্টা করে জ্বালিয়ে রেখেছি, যথাসম্ভব চেষ্টা করছি শিখাটা যাতে ছোট হয়ে না-আসে।

ভোরে আরও কাছিয়ে এল জাহাজটা। ভুল ভাঙল তখন–জাহাজ নয়, ছোট একটা নৌকা এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকে। দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছি নৌকায়। একজন বসে আছে সামনের দিকে, আরেকজন হালের কাছে। কিন্তু কাজটা ভালো পারে না সে বোঝা গেল, কারণ বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকে স্থির থাকছে না নৌকার গতি, এদিক-সেদিক করতে করতে একসময় সরে যেতে লাগল দূরে।

আমার হাতে ছিল জ্যাকেটের একটা টুকরো, প্রাণপণে সেটা নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। আগের মতোই মুখোমুখি বসে আছে, একবারও তাকাচ্ছে না দ্বীপের দিকে। দৌড়াতে লাগলাম, দ্বীপের সবচেয়ে নিচু শৈলান্তরীপ ধরে নেমে গেলাম যতখানি নীচে নামা সম্ভব, তারপর হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচাতে লাগলাম। লাভ হলো না এবারও। আগের মতোই উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছে নৌকাটা; ধীরে, খুব ধীরে ফিরে যাচ্ছে সাগরের দিকে।

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল তখন, দেখে চমকে উঠলাম। বিশাল একটা সাদা সামুদ্রিক পাখি নৌকা থেকে শূন্যে উড়াল দিল দু'দিকে দু'ডানা প্রসারিত করে। তারপর নৌকাটা কেন্দ্র করে চক্কর দিল কয়েকবার। কিন্তু পাখিটাকে যেন দেখলই না নৌকার লোক দু'জন, যেভাবে বসে ছিল বসে থাকল সেভাবেই। তারমানে অনেক আগে, আমি যখন নৌকাটা দেখেছি হয়তো তারও আগে, মরে গেছে ওরা।

চিৎকার-চেঁচামেচি থামিয়ে দিলাম, আস্তে আস্তে বসে পড়লাম শৈলান্তরীপের উপর। থুতনিটা দু'হাতে ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকলাম একদৃষ্টিতে। আগের মতোই উদ্দেশ্যহীনভাবে সরে যাচ্ছে নৌকাটা, সরে যাচ্ছে না-বলে বলা ভালো স্রোত যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে যাচ্ছে। স্রোত এখন পশ্চিমমুখী, নৌকাটাও তাই ওদিকেই যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা হলো সাঁতরে গিয়ে উঠি নৌকায়, কিন্তু অদ্ভুত একটা ভয় পেয়ে বসল আমাকে, পারলাম না কাজটা করতে।

বিকেলে, স্রোতের ধাক্কায় নৌকাটা এসে ঠেকল তীরে, বাড়ির ধ্বংসাবশেষের থেকে একশ' গজ দূরে। এবার উঠে দাঁড়ালাম, ধীর পায়ে হেঁটে এসে থামলাম নৌকাটার কাছে। যা ভেবেছিলাম তা-ই—মরে কাঠ হয়ে গেছে নৌকার লোক দু'জন। টেনেহিঁচড়ে নৌকা থেকে নামাতে হলো লাশদুটো। খেয়াল করলাম, একটা লাশের মাথায় ঝাঁকড়া লাল চুল—"আইপেকাকুয়ানহা" জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো অনেকটা। উঁকি দিয়ে দেখি ময়লা একটা সাদা ক্যাপ পড়ে আছে নৌকার ভিতরে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় নাক কুঁচকে ঘ্রাণ নিতে নিতে ঝোপের ভিতর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এল তিনজন পশুমানব। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে এই জন্তুগুলোর সঙ্গে দিন

কাটাতে কাটাতে আমার অনুভূতিগুলোও অন্যরকম হয়ে গেছে বোধহয়, তাই ওরা নিঃশব্দে এলেও টের পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গা গুলিয়ে উঠল আমার, আতঙ্ক ভর করল মনে। নৌকাটা ঠেলে নামালাম সাগরে, দেরি না-করে চড়ে বসলাম সেটাতে।

তিন পশুমানবের মধ্যে দুটোকে বানানো হয়েছে নেকড়ে থেকে; পচা লাশের দুর্গন্ধ যত যাচ্ছে ওদের নাকে তত বাড়ছে ওদের নাক কুঁচকানোর প্রবণতা, তত যেন আরও বেশি জ্বলজ্বল করছে ওদের চোখ। তৃতীয়টা উষ্টর মরোর হতচ্ছাড়া এক সৃষ্টি—ভালুক আর ষাঁড় থেকে বানানো কিম্ভূতকিমাকার এক জন্তু। ডানে-বামে না-তাকিয়ে সোজা লাশদুটোর দিকে এগোচ্ছে ওরা তিনজন, অনেকদিন পর উপাদেয় কোনো খাবার পাওয়ার আনন্দে মৃদু গর্জন ছাড়ছে একটু পর পর, তখন ঝিলিক দিয়ে উঠছে ওদের দাঁত। আর সহ্য করতে পারলাম না, আতঙ্কে মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা হলো আমার, পিছু ঘুরে একটানে বৈঠা তুলে নিয়েই বাইতে শুরু করলাম। সৈকতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে দেখার কথা মাথায় এল না।

কিন্তু বেশি দূর গেলাম না, শৈলশিরা আর দ্বীপের মাঝামাঝিই থাকলাম। পরদিন ভোরে ফিরে এলাম দ্বীপে। নৌকাটা লুকিয়ে রাখলাম শৈলশিরার কাছাকাছি একটা জায়গায়। একটা মুহূর্তের জন্যও থাকতে ইচ্ছা করছিল না দ্বীপে, মনের উপর জোর খাটিয়ে যোগাড় করে নিলাম কিছু ফল। খালি পিপাটা ভরে নিলাম নদী থেকে। ওত পেতে, পকেটের শেষ তিনটা বুলেট খরচ করে শিকার করলাম দুটো খরগোস।

যতক্ষণ দ্বীপে ছিলাম, প্রতিটা মুহূর্তে আশঙ্কায় কাঁপছিল বুক—এই বুঝি ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল কেউ। সেরকম কিছু ঘটল না, নিরাপদেই ফিরতে পারলাম নৌকার কাছে।

বাইশ

বিকেলে যাত্রা শুরু করলাম আবার। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে একটানা, যত এগোচ্ছি তত ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে দ্বীপটা। মোচাকৃতির চূড়ার মতো ধোঁয়ার লম্বা ও চিকন রেখাটা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, উজ্জ্বল সূর্যালোকের কারণে। আমার মনে হচ্ছে সমুদ্র যেন বিস্তৃত হচ্ছে দু'পাশে ধীরে ধীরে। খানিক বাদে পড়ে এল বিকেল, রোদের তেজ কমতে কমতে দীপ্তিময় একটা পর্দার মতো ঝুলে থাকল আকাশের এককোনায় কিছুক্ষণ, তারপর মিলিয়ে গেল একসময়। একটা-দুটো করে অসংখ্য তারা ফুটে উঠল আকাশে। আশপাশে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, সাগরে ঢেউ আছে তারপরও নিথর বলে মনে হচ্ছে আমার, মাথার উপরের অনন্ত আকাশটাও নিস্তব্ধ। চারদিক বড় বেশি নীরব, আর আমি একেবারেই একা।

তিনটা দিন কাটল এভাবেই। কোথায় যাচ্ছি জানি না, কতদিন ভাসতে হবে সমুদ্রে তা-ও জানা নেই। সুতরাং হিসেব করে খেতে হয় আমাকে, পানি খরচ করি যতটা না-করলেই নয়। যতক্ষণ পারি বৈঠা বাই, আর এই ক'দিন যা ঘটল সেসব নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি বিশ্রামের সময়। সমুদ্রগামী জাহাজের আশা ছেড়ে দিয়েছি, ধরেই নিয়েছি এ জীবনে সভ্য মানুষের দেখা পাবো না আর। তারপরও যদি কেউ কখনও উদ্ধার করে আমাকে, পরনের নোংরা

ছেঁড়া কাপড় আর মাথার কালো চুলের জট দেখে আমাকে যে পাগল মনে করবে সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

লোকালয়ে ফেরার কোনো ইচ্ছা আমার নেই দেখে নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগে আজকাল। পশুমানবদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছি এতেই আমি খুশি।

তৃতীয়দিন, অ্যাপিয়া থেকে সান ফ্র্যান্সিসকোগামী দু'মাস্তুলের একটা জাহাজ তুলে নিল আমাকে। স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন আর মেট, আমিও আদ্যোপান্ত বললাম, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো না আমার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হয়েছে ওদের। শেষে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে রায় দিলেন দু'জনই, একা থাকতে থাকতে মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে আমার, কী বলতে কী বলছি নিজেই নাকি জানি না। তর্কে গেলাম না, কারণ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আসলে। জানি এক কান-দু'কান করে পুরো জাহাজে ছড়াবে আমার কথা, আমি নিজের সাফাই যতই গাই না কেন ক্যাপ্টেন আর মেটের মতো বাকিরাও আমাকে পাগল ভাববে। সুতরাং চুপ হয়ে গেলাম। আমার গল্প শোনার ইচ্ছা নিয়ে আমার কাছে এসে যে যতই পীড়াপীড়ি করুক না কেন, সোজা বলে দিলাম "লেডি ভেইন" ডুবে যাওয়ার পর থেকে এই জাহাজ আমাকে উদ্ধার করার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার কোনো কিছুই ঠিকমতো মনে করতে পারছি না।

এদের যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আবারও একা একাই থাকতে হয় আমাকে। অবশ্য লম্বা একটা সময় ধরে আধা মানুষ আধা পশুদের সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষের সঙ্গে ঠিকমতো মেলামেশা করার অভ্যাসটাও হারিয়ে ফেলেছি আমি। তারপরও সতর্ক থাকি– আমার আচরণে বা কথাবার্তায় এমন কিছু যেন প্রকাশ না-পায় যাতে পাগল শব্দটা আপনাথেকেই জুড়ে বসে আমার নামের সঙ্গে।

একাকিত্ব মানেই কল্পনা, আর কল্পনা মানে স্মৃতির কাছে আত্মসমর্পণ–দ্বীপের প্রচলিত আইনের কথা, নৌকার মৃত দুই নাবিকের কথা, পশুমানবদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথা, বাঁশজঙ্গলে খুঁজে পাওয়া সেই লাশটার কথা বারবার মনে পড়ে যায়। আগেও বলেছি, সভ্য মানুষের দেখা পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম; কিন্তু তারপরও মনের গহীনে হয়তো নিজের অজান্তেই ধরে নিয়েছিলাম যদি কখনও কারও দেখা পাই, লোকটা আমার কথা মন দিয়ে শুনবে, সহমর্মিতা দেখাবে আমার প্রতি, একটুখানি হলেও বিশ্বাস করবে আমাকে। কিছুই হলো না দেখে আজকাল অনিশ্চয়তায় ভুগি আমি, কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে অকারণেই।

যন্ত্রণা আরও বাড়ল আমার। একদিন হঠাৎ করেই টের পেলাম, আশপাশের লোকগুলোকে পশুমানব বলে মনে হচ্ছে। ওদের ভিতরের আত্মা মানুষের, কিন্তু দেহাবয়ব যেন পশুর। দ্বীপের পশুমানবরা যেমন পাল্টাতে শুরু করেছিল, পশুমানব থেকে আচরণগত দিক দিয়ে পশুতে পরিণত হচ্ছিল, এরাও যেন পাল্টে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পশুত্বের লক্ষণ একটা একটা করে প্রকাশ পাচ্ছে সবার মধ্যে। কারও চেহারা তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, কাউকে দেখলেই মনে হয় বোকা বা বিপজ্জনক, কেউ কেউ আবার দায়িত্বজ্ঞানহীন। জানি ভুল করছি–চারপাশের লোকগুলো আসলেই মানুষ, পশুমানবদের চেয়ে অনেক আলাদা। কিন্তু তারপরও ওদেরকে দেখলে, আমার প্রতি ওদের কৌতূহল টের পেলে, ওরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে অথবা আমাকে ওরা সাহায্য করতে চাইলে মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে যাই। দূরে থাকা ছাড়া, একা থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না আমার।

লন্ডনে ফিরে এলাম একসময়, থাকতে শুরু করলাম সেখানে। আমার ভয়টা পেয়ে বসল আমাকে, অসহনীয় হয়ে উঠল দিন দিন।

যেদিকেই যাই কেবল মানুষ আর মানুষ। আমার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে কিংবা বন্ধ দরজা ভেদ করে ঢোকে ওদের কণ্ঠ। দম আটকে আসে আমার, একছুটে ঘর ছেড়ে বের হয়ে চলে যাই রাস্তায়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না তাতে। পথিকরা চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে, ক্লান্ত বিধ্বস্ত শ্রমিকরা কাশতে কাশতে চলে যায় আমাকে পাশ কাটিয়ে, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া বুড়োদের দেখি নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করতে করতে চলে যাচ্ছে। গির্জায় গিয়ে ঢুকি মাঝেমধ্যে, সবাই যখন মাথা ঝাঁকিয়ে সুর করে শ্লোক পাঠ করে তখন মনে পড়ে যায় ডক্টর মরোর দ্বীপের অদ্ভুত সেই আইনের কথা, বড় বড় লোমে আবৃত সেই প্রাণীটার কথা যে "আইন আবৃত্তি"র কাজে সাহায্য করত বাকিদের।

সুতরাং একসময় বাধ্য হয়ে নিজেকে একরকম গুটিয়েই নিলাম সমাজ থেকে। আজকাল আমার বেশিরভাগ সময় কাটে বই পড়ে আর রসায়ন নিয়ে গবেষণা করে। মেঘমুক্ত রাতগুলোতে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে: তারা দেখি, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করি। জানি না কেন স্বর্গীয় এক শান্তি পাই আমি তখন। কেন যেন মনে হতে থাকে, পশুত্বের চেয়ে উত্তম যা কিছু আছে আমাদের ভিতরে, সেগুলোই আমাদের জন্য সান্ত্বনা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এত দুঃখ-কষ্ট আর পাপের পরও ওগুলো নিয়েই বেঁচে আছি আমরা, বেঁচে থাকবো।

আমিও বেঁচে আছি ওই একই আশা নিয়ে, একাকিত্ব নিয়ে, আর অবিশ্বাস্য একটা গল্প নিয়ে। যে-গল্পের সমাপ্তি এখানেই।

এডওয়ার্ড প্রেনডিক

***